মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১১

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের নেতৃত্বে ১৪ দলের সমন্বয়ে আওয়ামী লীগ জোট সংসদে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনকে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পর্যবেক্ষকরা অবাধ ও সুষ্ঠু বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য বিচ্ছিন্ন কিছু অনিয়ম ও বিক্ষিপ্ত কিছু সংঘর্ষের ঘটনা এই নির্বাচনে ঘটেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা বেসামরিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করেছে।

সবচেয়ে উলে-খযোগ্য মানবাধিকার সমস্যা হল নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক হত্যা ও নির্যাতন; সামাজিক সহিংসতা এবং নারীর প্রতি বৈষম্য, যদিও সাম্প্রতিককালে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে; এবং আদিবাসী মানুষদের প্রতি সরকারের বৈষম্য ও সামাজিক সহিংসতা থেকে তাদেরকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা।

অন্যান্য মানবাধিকার সমস্যার মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক নিপীড়ন। তারা নিরাপত্তা হেফাজতে মৃত্যু, নির্যাতন, যথেচ্ছ গ্রেফতার ও আটকের জন্য দায়ী ছিল। জেলখানার অবস্থা ছিল কখনো কখনো জীবনের প্রতি হুমকিস্বরূপ। বিচার-পূর্ব দীর্ঘমেয়াদি আটকাবস্থা একটি সমস্যা হিসেবেই রয়ে গেছে। বিচার ব্যবস্থায় দলীয়করণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জিরত বিচার ব্যবস্থার সমস্যা আরো বৃদ্ধি পায় এবং বিরোধীদলের সদস্যদের সুবিচার পাওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে। সরকার বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সীমিত করে, স্ব-আরোপিত বা সেল্ফ-সেন্সরশিপ অব্যাহত থাকে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে সাংবাদিক হয়রানির ঘটনা ঘটে। সরকার সমাবেশ করার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংগঠিত সহিংসতা একটি সমস্যা হিসেবে থেকে যায়। সরকারি ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে অব্যাহত থাকে। মানব পাচারের মতই শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে রয়ে যায়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্যের সমস্যাটি ছিল। ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের ওপর সামাজিক সহিংসতার ঘটনা অব্যাহত ছিল, যদিও সরকারি ও সুশীল সমাজের অনেক নেতা বলেছেন যে, এসব ঘটনার পিছনে প্রায়শই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস বা আনুগত্যের কারণে এমনটি ঘটেছে- তা বলা যাবে না। যৌনমুখিতার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য অব্যাহত রয়েছে। শ্রম অধিকারের ওপর বিধি-নিষেধ, শিশুশ্রম ও কাজের অনিরাপদ পরিবেশ একটি সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে।

বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিচারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাওয়া অর্থাৎ দায়মুক্তি একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য বিশেষ করে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান বা র‍্যাব দায়মুক্তি নিয়ে কাজ করেছে। সরকার নিরাপত্তা বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করার জন্য কোন সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সরকারি ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি ও এ ক্ষেত্রে আইনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাওয়া অব্যাহত ছিল। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরোধী পক্ষ বলে যাদেরকে মনে করা হয়েছে সেইসব সরকারি কর্মকর্তারাই প্রধানত ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য শাস্তির সম্মুখীন রয়েছে।

সেকশন ১ ব্যক্তির মর্যাদার প্রতি সম্মান,নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থেকে মুক্তিসহ

ক. জীবনের যথেচ্ছ বা বেআইনি বঞ্চনা

নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটায়। পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) (সাবেক বাংলাদেশ রাইফেলস) এবং র‍্যাব কখনও কখনও অযাচিতভাবে প্রাণঘাতী/মারাত্বক শক্তি প্রয়োগ করেছে।

র‍্যাবের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণের অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। যেমন, স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের মতে, কুমিল-ার স্থানীয় রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামকে র‍্যাব ঢাকার কাছে নারায়ণগঞ্জে ৪ এপ্রিল গুলি করে মেরে ফেলেছে। র‍্যাব শফিকুলকে ঢাকা শহরের ডেমরা এলাকা থেকে তুলে একটি গ্রামে নিয়ে যায়। তার নামে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দায়ের করা বেশ কিছু ফৌজদারি মামলা রয়েছে। কোম্পানি কমান্ডার আরমান উদ্দিন চৌধরীর ভাষ্য অনুযায়ী র‍্যাব এবং একদল "ডাকাতে"র মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে শফিকুল নিহত হয়েছে। বন্দুকযুদ্ধে সে অংশগ্রহণ করেছিল কিনা সে বিষয়ে র‍্যাব কিছু জানায়নি, তবে অফিসিয়াল বিবৃতিতে তার বিরুদ্ধে পূর্বে দায়ের করা মামলার কথা উলে-খ করা হয়েছে। ময়না তদন্তে শফিকুলকে পাঁচবার গুলি করা হয়েছে বলে উলে-খ করা হয়েছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো এ ঘটনার একটি আনুষ্ঠানিক ও স্বচ্ছ তদন্ত দাবি করেছে, তবে বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত তদন্ত হয়নি।

নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে মোট কতজন নিহত হয়েছে সরকার তার কোন পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি। এসব ঘটনার তদন্ত করতে সরকার সমন্বিত কোন পদক্ষেপ নেয়নি। পত্রপত্রিকা এবং স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানায়, এসব হত্যাকাণ্ডের কোনটির জন্যই কারো ফৌজদারি আইনে সাজা হয়নি। যে গুটিকয় ক্ষেত্রে সরকার অভিযোগ গঠন করেছিলো তাতে কারো অপরাধ প্রমাণ হলেও সাজা হয়েছে মূলত প্রশাসনিক পর্যায়ে। নিরাপত্তা বাহিনীর কিছু কিছু সদস্য বিচারের আওতার বাইরে থেকে যায়। ২০০৪ সাল থেকে, যখন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন যে র‍্যাব ও পুলিশের হেফাজতে ক্রসফায়ারে মৃত্যু হলে তাকে নিরাপত্তা হেফাজতে মৃত্যু হয়েছে বলে ধরা যাবে না, তখন থেকে হত্যার জন্য র‍্যাব কর্মকর্তার বিচারের বিষয়ে সরকার কোন কিছু প্রকাশ করেনি।

স্থানীয় গণমাধ্যম, দেশী ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং সরকারের ভাষ্য মতে, র‍্যাবের হাতে এ বছর নিহত হয়েছেন ৪৩ ব্যক্তি। গত বছর এই বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলেন ৬৮ জন। র‍্যাব সদস্যদের নিয়ে গঠিত সম্মিলিত নিরাপত্তা বাহিনী আলোচ্য বছরে আট জনকে হত্যা করে। মৃত্যুগুলো ঘটেছে, কিছু কিছু অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, অভিযান, গ্রেফতার এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগ অভিযান চালানোর সময় বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকা অবস্থায়। সরকার অবশ্য প্রায়শ এই ধরনের ঘটনাকে র‍্যাব বা পুলিশের সাথে অপরাধী দলগুলোর সংঘটিত "ক্রসফায়ার", "বন্দুকযুদ্ধ" বা "এনকাউন্টার" বা সংঘর্ষের কারণে মৃত্যুর ঘটনা বলে অভিহিত করেছে।

যেমন, পত্রপত্রিকা ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর প্রতিবেদন অনুসারে, ঢাকার উত্তরা এলাকায় ১২ আগস্ট র‍্যাব পাঁচ ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে। র‍্যাবের মতে, মোহাম্মদ হাসান, মোস্তফা হোসেন, সুরুজ মিয়া এবং মোহাম্মদ মারুফকে বহনকারী একটি গাড়ি থেকে র‍্যাবের দিকে প্রথমে গুলি ছোড়া হলে র‍্যাবের কর্মকর্তারা ওই গাড়িটিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এই দাবির বিপক্ষে ডেইলি স্টার প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানায় যে, নিহত ব্যক্তিদেরকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে এবং তারা কোন গুলি ছোড়েনি। র‍্যাব ছাড়া অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মীদের হাতে ৩৩ জন মারা যায়, যাদের ১৫ জন মারা যায় ক্রসফায়ারের ঘটনায়।

মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) জানায়, আলোচ্য বছরে পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ২১৬ টি। এর মধ্যে কারাগারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ১১৬ টি। এগুলোর মধ্যে অনেক মৃত্যুই নির্যাতনের কারণে ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন অনুসারে চট্টগ্রামে ৩০ এপ্রিল মোহাম্মদ মুবারক আলী পুলিশি হেফাজতে মারা যায়। রিকশা চালক মুবারককে মাদক সংক্রান্ত মামলায় আটক করা হয়েছিল। পুলিশি হেফাজতের প্রাথমিক মেয়াদ শেষ হবার পর তার দেহে মারের চিহ্ন দেখা গিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর পুলিশের রিপোর্টে "মাদকের ওপর নির্ভরশীলতা প্রত্যাহারের উপসর্গ (উইথড্রয়াল সিনড্রোম)"- কে তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে উলে-খ করা হয়। তবে, ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন অনুসারে মুবারক মাদকাসক্ত ছিল না।

২০১০ সালের মে মাসে পুলিশি হেফাজতে মোহাম্মদ মানিককের মৃত্যু সংক্রান্ত মামলাটি এখনো চলছে। অভিযোগ করা হয় যে, উপপরিদর্শক ইউনুস মিয়া তাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলে।

২০১০ সালের মে মাসে মারা যাওয়া আবুল কালাম আজাদের মৃত্যুর ঘটনার ক্ষেত্রেও কোন অগ্রগতি হয়নি। আজাদের পরিবার দাবি করে যে, র‍্যাব তার পিতাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলেছে।

অধিকার জানায়, মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের মৃত্যু ঘটনা তদন্তে গঠিত তদন্ত কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে "ছিনতাইকারীদের" গুলির আঘাতে মিজানুরের মৃত্যু ঘটেছে। জুন ২০১০ তারিখে পুলিশ উপপরিদর্শক আনিসুর রহমান জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাকে গুলি করে মেরে ফেলে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।

এক রাজনৈতিক দলের সমর্থক অন্য রাজনৈতিক দলের সমর্থককে মেরে ফেলেছে বলে উলে-খযোগ্য সংখ্যক প্রতিবেদন প্রকাশ পেলেও দলের নেতৃবৃন্দের সমর্থন রয়েছে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

গত বছরের তুলনায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সহিংসতা হ্রাস পেয়েছে; যদিও আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সহিংসতার মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। বিরোধীদলের সমর্থকেরা দাবি করছেন যে, তারা শাসক দলের সমর্থকদের দ্বারা হামলা ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। সহিংসতার কারণ অনেকসময় অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে। অধিকারের মতে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ১৩৫টি হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ২২০টি। আওয়ামী লীগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ৩৪০টি ঘটনা এবং বিএনপির মধ্যে ১০৪টি ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ২২ জন নিহত হয় এবং

৩৭৭০ জন আহত হয়। বিএনপির মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ০৩ জন নিহত হয় এবং ১২৩৪ জন আহত হয়। এছাড়াও ছোটখাটো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে যেখানে কেউ হতাহত হয়নি (সেকশন ১.গ দেখুন)।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সহিংসতার সমস্যা রয়েই গেছে। তবে বেশ কয়েকটি আন্তঃসরকার বৈঠকের পর এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৫৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী অর্থাৎ বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডও সীমান্তে গুলি বিনিময় করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা এ বছর ৩১ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে, গত বছর ছিল ৯৮ জন। যেমন, অধিকারের মতে, জানুয়ারির ৭ তারিখে ভারতীয় বাহিনী সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করার চেষ্টা করায় ১৫ বছর বয়সী ফিলানি খাতুনকে গুলি করে মেরে ফেলে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ফেলানিকে বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার পূর্বে তার দেহ পাঁচ ঘণ্টা ধরে কাঁটাতারে ঝুলেছিল।

খ. গুম হওয়ার ঘটনা

অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক গুম ও অপহরণের ঘটনা এ বছর উলে-খযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এর সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায়নি। অপহরণের ঘটনার অন্তত কিছু সংখ্যক ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। তবে অনেক অপহরণের ঘটনা ঘটেছে অর্থ আদায় করার জন্য অথবা স্থানীয় কোন বিবাদের জের ধরে। অধিকার জানায়, ৩০টি গুম করার ঘটনার ঘটেছে যার সাথে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকদের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে অভিযোগ আছে। ২০১০ সালে এ ধরনের ঘটনা ঘটে নয়টি। র‍্যাবের মতে, এ সংস্থাকে সেইসব গুমের ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়েছে যেগুলো র‍্যাব সেজে সাধারণ নাগরিকেরা ঘটিয়েছে।

যেমন, অধিকার জানায়, ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখে র‍্যাব ঢাকার উত্তর শাহজাহানপুর এলাকার একজন ইমাম ও বিক্রেতা মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামকে আটক করে। প্রত্যক্ষদর্শী এবং ওই ব্যক্তির মেয়ের জামাইয়ের দায়ের করা পুলিশ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কিছু সাধারণ ও র‍্যাবের পোশাক পরা লোক রফিকুলকে আটক করে একটি ঢাকা পিকআপ ট্রাকে উঠতে বাধ্য করে। র‍্যাব তাকে গ্রেফতার করার কথা অস্বীকার করে। বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত রফিকুল কোথায় আছে তা জানা যায়নি।

২০১০ সালের জুন মাসে মোহাম্মদ চৌধুরী আলম,ঢাকায় বিএনপির একজন সিটি কাউন্সিলর, যিনি র‍্যাব কর্তৃক আটক হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল; বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্তও তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

গ. নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি

সংবিধানে নির্যাতন চালানো এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর শাস্তিদান নিষিদ্ধ হলেও র‍্যাব ও পুলিশসহ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা প্রায়শ আটক ও জিজ্ঞাসাবাদের সময় নির্যাতন চালায় এবং চরম শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন করে। এসব নিপীড়নের মধ্যে রয়েছে হুমকি প্রদান, মারধর ও বিদ্যুতের শক প্রয়োগ করা। অধিকারের মতে, এবছর নিরাপত্তা বাহিনী কমপক্ষে ৪৬ জনের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। এসবের জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে সরকার কদাচিৎই অভিযোগ গঠন করেছে, দোষী সাব্যস্ত করেছে বা শাস্তি দিয়েছে। আইনের ঊর্ধ্বে থাকার এই পরিবেশের কারণে র‍্যাব ও পুলিশ এ ধরনের নিপীড়ন করার সুযোগ পেয়েছে।

ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট যে কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেফাজতে নেয়ার আদেশ দিতে পারেন যা রিমান্ড নামে পরিচিত। এ সময়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তির আইনজীবীর অনুপস্থিতিতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। এ বছর সরকার রিমান্ডের জন্য যে সময় বরাদ্দ করা হয় তা কমানোর চেষ্টা করে। তবে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দেননি। রিমান্ডের সময়ই অধিকাংশ নিপীড়নের ঘটনা ঘটে থাকে।

যেমন, সংবাদপত্র ও মানবাধিকার প্রতিবেদন অনুসারে ঢাকা মহানগর পুলিশ বিরোধীদল বিএনপিপন্থী সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী মমতাজ উদ্দিন আহমেদকে ১৫ দিন আটক রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আগস্টের ২৬ তারিখে সে মারা যায়। আহমেদের পরিবার অভিযোগ করে যে, তাকে নির্যাতন করা হয়েছিল, যার ফলে তার হার্ট অ্যাটাক হয়। আহমেদের স্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করেন। পুলিশ আহমেদকে নির্যাতন করার কথা অস্বীকার করে এবং এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্তের ফলাফল বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত ছিল অসম্পূর্ণ।

২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে র‍্যাব কর্তৃক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আরিফকে নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগ তদন্তের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়- গঠিত তদন্ত কমিটি তার তদন্ত সম্পন্ন করেছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হত্যার তদন্তের জন্য একটি আবেদন দাখিল করেছিল। বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্তও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় তদন্তের প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরি এখনো ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যুদ্ধাপরাধের সাথে তার জড়িত থাকার বিষয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের অপেক্ষায় কারারুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। চৌধুরীর পরিবার অভিযোগ করে যে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাকে নির্যাতন করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ এ অভিযোগ অস্বীকার করে। চৌধুরীকে এরপর সুরক্ষামূলক নিরাপত্তা হেফাজতে সরিয়ে নেয়া হয় এবং চিকিৎসার গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়। তবে তার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ বিরাজ করছিল।

অধিকার জানায়, পুলিশ কর্মকর্তা বা সামরিক বাহিনীর সদস্যরা কমপক্ষে চারটি ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটিয়েছে বলে রেকর্ড করা হয়েছে।

কারো মৃত্যু ঘটেনি এমন রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনাও ঘটেছে। যেমন, সংবাদপত্র ও মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, ৬ই জুলাই বিএনপি'র দেশব্যাপী হরতাল চলাকালে সংসদ ভবনের কাছে একটি মিছিলে

নেতৃত্বদানের সময় পুলিশ বিএনপির সংসদ সদস্য ও দলের চিফ হুইপ জয়নুল আবেদিন ফারুককে নির্মমভাবে প্রহার করে। ফারুক মাথায় গুরুতর আঘাত পায় এবং এ ঘটনার পর পরই চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে চলে যায়। বিএনপিপন্থী পত্রিকা আমার দেশের প্রতিবেদন অনুসারে, এ ঘটনার সাথে জড়িত দুজন পুলিশ কর্মকর্তার উভয়ই ঢাকা বিভাগের কিশোরগঞ্জ জেলার প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা। পরবর্তীতে পুলিশের দায়িত্ব পালনে বাধাদানের জন্য পুলিশ ফারুকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত মামলাটি অমীমাংসিত ছিল।

সব বড় দলের ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সহিংস ঘটনার জন্য দায়ী ছিল। ২০১০ সালে রাজনৈতিক দলগুলো থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্র সংগঠনগুলোকে পৃথক করা হয় এবং গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে অনেক সংঘাতের ঘটনাই রাজনৈতিক বিরোধিতার পরিবর্তে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বা ব্যক্তিগত কারণে ঘটেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক করা হলেও সকল প্রধান রাজনৈতিক দলের কিছু রাজনীতিবিদ আন্দোলন ও বিক্ষোভ করার জন্য ছাত্র সংগঠনের সদস্যদেরকে উৎসাহিত করে।

যেমন, অধিকারের মতে, আগস্টের ১৪ তারিখে সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কর্মীরা তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ, জ্বালানি ও বন্দররক্ষাকারী কমিটির এক সভায় হামলা চালায়। এ সংগঠনটি সরকারের জ্বালানি নীতির বিরোধিতা করে। ছাত্রলীগের সদস্যরা সভাটি পন্ড করে দেয় এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে মারধর করে ছত্রভঙ্গ করে। এতে সাত ব্যক্তি আহত হয়।

কারাগার ও হাজতখানার অবস্থা

কারাগারগুলোর অবস্থা কখনো কখনো জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ রয়ে গেছে, কারণ এতে নেই তিল ধারণের জায়গা, নেই পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এবং রয়েছে উপযুক্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব। মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের মতে, পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনার জন্য মূলত জেলখানার এই করুণ অবস্থা দায়ী।

অধিকারের মতে, আলোচ্য বছরে কারাগারে মারা গেছেন ১০৫ ব্যক্তি এবং পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে মারা গেছেন ১৪০ জন। অন্যদিকে ২০১০ সালে কারাগারে মারা গিয়েছিল ৪৬ জন ও নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে মারা যায় ১০৯ জন।

সরকার জানায়, বছরের শেষ নাগাদ দেশের জেলখানাগুলোয় মোট বন্দীর সংখ্যা ছিল ৬৯,৮৫০ জন, যা দেশের জেলখানাগুলোর মোট বন্দী ধারণ ক্ষমতার ২৩৭ শতাংশ বেশি। জেলখানাগুলোয় মোট বন্দী ধারণ ক্ষমতা ২৯, ৪৫০ জন। মোট বন্দীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ সাজাপ্রাপ্ত। বাকিরা হয় বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন নয়ত তদন্তের জন্য তাদের আটক করা হয়েছে। মামলার এত ব্যাপক জট আছে যে বিচারে তাদের সর্বোচ্চ দণ্ড হলেও দেখা যাবে হয়ত তার চেয়ে বেশি দিন তারা আগেই কারাগারে কাটিয়েছেন। জেলে বন্দীর সংখ্যা এত বেশি যে, বন্দীদেরকে পালাক্রমে ঘুমাতে হয় এবং তাদের জন্য পর্যাপ্ত শৌচাগার সুবিধাও নেই। অনেকসময় একই জেলখানার এলাকার ভেতর বিভিন্ন কারাগারের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। অতিরিক্ত সংখ্যক বন্দী থাকার ফলে বন্দীদের উচ্চ তাপমাত্রায় থাকতে হয়, সেখানে বায়ু চলাচলের ভালো ব্যবস্থা থাকে না। অন্যদিকে যেসব বন্দী ডিভিশন পায়, তারা তুলনামূলক ভালো অবস্থায় থাকে। তারা পরিবারের সদস্যদের সাথে বেশি দেখাসাক্ষাৎ

করতে পারে এবং তাদের জন্য একজন গৃহস্থালী কর্মী থাকে। রাজনৈতিক যোগাযোগ ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনেকসময় একজন বন্দীকে কি অবস্থায় রাখা হবে তার ওপর প্রভাব ফেলে। সব বন্দীদের পানি ও চিকিৎসা সেবা লাভের অধিকার রয়েছে। তবে পুরো বছর জুড়ে মানবাধিকার সংস্থাগুলো ও গণমাধ্যম জানিয়েছে যে, অনেক বন্দীই এসব অধিকার পায়নি এবং যে পানি পাওয়া গিয়েছে তা অনেক সময়ই সুপেয় ছিল না।

আইন অনুযায়ী, শিশুকিশোর বন্দীদের বয়স্ক বন্দীদের থেকে আলাদাভাবে রাখার কথা; কিন্তু বাস্তবে অনেক শিশুকিশোর বন্দীকে বড়দের সাথে এক সঙ্গে রাখা হয়। শিশুদের আটক রাখা আইনত নিষিদ্ধ হলেও এবং এ ব্যাপারে আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আনুমানিক ৩০০ জনের মত শিশু দেশে বন্দী আছে (কেউ কেউ আছে তাদের মায়েদের সাথে)। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সংখ্যা অনেক বেশি। কেননা ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় বয়স নিরূপণের যথাযথ ব্যবস্থা নেই। ২০০৮ সালের আন্তর্জাতিক জেল সমীক্ষা কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শিশু বন্দীর সংখ্যা বন্দী জনসংখ্যার ০.৪ শতাংশ।

আইন অনুযায়ী "নিরাপত্তা হেফাজতে" থাকা নারী বন্দীদেরকে (সাধারণত ধর্ষণ, পাচার ও পারিবারিক নির্যাতনের শিকার নারী) সাধারণ অপরাধীদের থেকে আলাদা করে রাখার কথা থাকলেও এসব পরিস্থিতিতে কর্মকর্তারা তাদের জন্য সবসময় আলাদা ব্যবস্থা করেনি। অধিকারের মতে ২৪০২ জন নারী কারাগারে বিচারের অপেক্ষায় বন্দী ছিল।

বন্দীদেরকে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের অনুমতি দেয়া হয়। বন্দীদেরকে কর্তৃপক্ষের কাছে কোন সেন্সর ছাড়াই অভিযোগ দায়েরের অনুমতি দেয়া হয় এবং কর্তৃপক্ষ মাঝে-মধ্যে এইসব অভিযোগের তদন্ত করে।

আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটিসহ স্বাধীন মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদেরকে সরকার সাধারণত জেলখানা পরিদর্শনের অনুমতি দেয়নি। বিশিষ্ট সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে সরকার গঠিত কমিটি মাসে একবার প্রতিটি এলাকার জেলখানার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেও এসব কমিটি তাদের প্রাপ্ত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি। জেলা জজগণ কখনও কখনও জেলখানা পরিদর্শন করলেও কদাচিৎ তারা তাদের প্রাপ্ত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন।

এ বছর কারাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য খুব কম প্রচেষ্টাই ছিল।

ঘ. যথেচ্ছ গ্রেফতার ও আটক

সংবিধানে যথেচ্ছ গ্রেফতার বা আটক নিষিদ্ধ। তবে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার ও আটক অনুমতি আইনে আছে।

বিরোধীদলের ডাকা দেশব্যাপী হরতাল পালনের সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের ব্যবহারকে আইন বিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকার কর্মীরা সমালোচনা করেন। হরতালকে যারা বেআইনিভাবে সমর্থনের চেষ্টা করে তাদেরকে শাস্তি

দানের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত ঘটনাস্থলেই ব্যক্তির বিচার করে রায় প্রদান করে। এ রায়ের মধ্যে অনেকসময় কারাদন্ডও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যেমন, অধিকার জানায়, ৫ জুলাই দেশব্যাপী হরতালের সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত খন্দকার আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ আনে। অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, আসাদুজ্জামান ঘটনাস্থলের আশপাশে ছিলেন না। তবে, ভ্রাম্যমাণ আদালত দ্রুত বিচার করে তাকে ছয়মাসের কারাদন্ড দেয়। আসাদুজ্জামান পুলিশের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ আনে এবং বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত সে কারাগারে আটক ছিল।

পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয়ভাবে সংগঠিত পুলিশের দায়িত্ব অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। সেনাবাহিনী বাহ্যিক নিরাপত্তার জন্য দায়ী, তবে তাদের কিছু অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বও রয়েছে, যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তা। পুলিশ সাধারণভাবে ক্ষমতাসীন দলের সাথে সংশিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্তে অকার্যকর এবং অনিচ্ছুক ছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে আইনের হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার ঘটনা অনেক। নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন তদন্তের ব্যবস্থা থাকলেও বাস্তবক্ষেত্রে সেগুলোর বাস্তবায়ন করা হয় না। পুলিশকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের মধ্যে পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য এবং দুর্নীতি হ্রাস করতে সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন, র‍্যাব একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় বিষয়ক ইউনিট প্রতিষ্ঠার জন্য কারিগরি সহায়তা চায়।

২০১০ সালের অক্টোবর মাসে নাটোর জেলার বারিগ্রাম উপজেলায় ছাত্রলীগ কর্মীদের বিএনপির মিছিলে হামলা চালিয়ে চেয়ারম্যান সানাউল-াহ নুর বাবুকে হত্যার ঘটনাটির অগ্রগতি থেমে আছে, কারণ ২৭ জন অভিযুক্তের সকলেই জামিনে মুক্তি পেয়েছে। এ ঘটনার ভিডিও ইন্টারনেটে দেয়া হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে স্থানীয় একজন আওয়ামী লীগ নেতা বাবুকে পিটিয়ে মেরে ফেলছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমকে জানায় যে, মামলাটির অগ্রগতি হবে, তবে এর কোন সময়সীমা উলে-খ করা হয়নি। পরবর্তীতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ এমপি আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা দেয়ার সময় বলেন, এ ব্যাপারে 'তাদের দুঃশ্চিন্তার কিছুই নেই'।

২০১০ সালের আগস্ট মাসে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার ২০০১ সালে ঢাকার মালিবাগ এলাকায় বিএনপি'র মিছিলে গুলি বর্ষণের জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে পূর্বে দায়ের করা মামলাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রত্যাহার করে নেয়। প্রত্যক্ষদর্শী ও গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে আওয়ামী লীগের এক এমপিসহ ২৩ জন সুপরিচিত আওয়ামী লীগ কর্মীকে অভিযুক্ত করা হয়। যে দলটি বিএনপির মিছিলে গুলি চালিয়ে চারজন ব্যক্তিকে হত্যা ও আরো চারজনকে আহত করে এ আওয়ামী লীগ নেতারা সেটির অগ্রভাগে ছিলেন। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এ ঘটনার ছবিতেও দেখা যায় অভিযুক্তদের অনেকেই অস্ত্র মাথার ওপর দোলাচ্ছে। অভিযুক্তদের অনুপস্থিতির কারণে চারটি হত্যা মামলা স্থবির অবস্থায় আছে।

২০১০ সালের জুন, আগস্ট এবং অক্টোবরে টাঙ্গাইল জেলার আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর তিন দফায় হামলা চালানো হয় । প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে হামলাকারীরা আহমেদিয়াদের গ্রামে প্রবেশ করে, সম্প্রদায়ের পুরুষ সদস্যদেরকে মারধর করে এবং বাড়িঘর ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করে। হামলাকারীরা ২০ জনেরও বেশি

ব্যক্তিকে আহত করে রেখে যায়। সম্প্রদায়ের সদস্যরা পুলিশকে এ হামলার বিষয়ে জানিয়েছে, তবে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি।

বিচারে দীর্ঘসূত্রিতা এবং পুলিশের পাল্টা প্রতিশোধের ভয়ে খুব কম মানুষই পুলিশের অপরাধমূলক কাজকর্মের জন্য পুলিশকে অভিযুক্ত করেছে। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের প্রতি এই অনীহা পুলিশদের জন্য একটি দায়মুক্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

নিরাপত্তা বাহিনী প্রায়শ সামাজিক সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে (সেকশন ২.ঘ. দেখুন)।

গ্রেফতার পদ্ধতি ও আটকাবস্থায় আচরণ

আইনে ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম বা গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই সন্দেহভাজন অপরাধীদের আটক করার বিধান রয়েছে এবং সরকার এসব বিধানের সুযোগ নিয়েছেন হরহামেশাই। সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হতে পারে এমন কোন কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য কোন ব্যক্তিকে ৩০ দিনের আটকাদেশ দিতে পারেন; তবে কর্তৃপক্ষ এর চেয়ে বেশি সময় ধরে লোকদের আটক রেখেছেন। এই ধরনের আটকের বেলায় ম্যাজিস্ট্রেট আটক ব্যক্তিকে অবশ্যই আটক রাখার কারণ জানাবেন এবং আটকের মেয়াদ চার মাসের বেশি হলে একটি উপদেষ্টা বোর্ড আটককৃত ব্যক্তির বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখবেন। আটক ব্যক্তিদের আপিল করার অধিকার আছে।

স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং স্থানীয় পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায়, আলোচ্য বছরে কর্তৃপক্ষ গড়ে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ২০০০ লোককে আটক করেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আটকের দুই একদিনের মধ্যেই গ্রেফতারকৃতদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে, প্রায়শই ঘুষের বিনিময়ে।

জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠনের সাথে পুলিশের সংঘাতের পর আওয়ামী লীগ সরকার সেপ্টেম্বরের ১৯ তারিখ সংগঠনটির কর্মীদের ওপর গণগ্রেফতার চালায়।

সাধারণ আদালতে জামিন নেয়ার একটি বিধান প্রচলিত ও কার্যকর ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত প্রায় সব বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাকে আদালত জামিন দেয়। তবে রাজনৈতিক বিষয় জড়িত থাকলে এ ব্যবস্থা অনেকসময় ধীর গতিতে কাজ করেছে। অপরদিকে অ্যাটর্নি জেনারেল ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারাকে লঙ্ঘন করে আদেশ প্রদান করেন যে জামিনের ব্যাপারে তার দপ্তরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে আটক বেশিরভাগ ব্যক্তি আইনজীবীর সুবিধা পেয়েছেন। সরকার আটক ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্রীয় খরচে আইনজীবী নিয়োগ কদাচিৎই করেছেন এবং বন্দীদের জন্য খুব স্বল্প সংখ্যক আইনগত সহায়তা কর্মসূচি ছিল। সরকারের আইন সহায়তা কর্মসূচিতে তহবিল বরাদ্দ হয়েছে খুব কম এবং আলোচ্য বছরে এসব কর্মসূচি সম্প্রসারণের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। সাধারণত আদালতে আনুষ্ঠানিকভাবে

অভিযোগ দায়ের করার পরেই কেবল সরকার আইনজীবীদেরকে তাদের মক্কেলদের সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিয়েছেন। আর অনেক ক্ষেত্রে এসব মামলা দায়ের হয়েছে কাউকে আটক করার বেশ কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর।

যথেচ্ছ আটক: আলোচ্য বছরে যথেচ্ছ আটকের ঘটনা ছিল সাধারণ ব্যাপার এবং সরকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া অনেককে আটক রেখেছেন। অনেক সময়ই এটা করা হয়েছে অন্যান্য সন্দেহভাজন ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য।

বিচারপূর্ব আটকাবস্থা: আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা, সীমিত সম্পদ, বিচারপূর্ব আটক রাখার আইনের ঢিলেঢালা প্রয়োগ এবং দুর্নীতির কারণে আলোচ্য বছরে যথেচ্ছ এবং দীর্ঘমেয়াদী বিচারপূর্ব আটক রাখার ঘটনা একটি সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান ছিল। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার জট ছিল ২০ লাখের মত। ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক জেল সমীক্ষা কেন্দ্র জানায়, বাংলাদেশের জেলগুলোর মোট বন্দীর প্রায় ৭০ শতাংশই ছিলেন বিচারপূর্ব আটক অবস্থার বন্দী।

ঙ. প্রকাশ্য ও ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চনা

আইনে একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। তবে বাস্তবে দীর্ঘদিন ধরে বলবৎ সংবিধানের একটি অস্থায়ী ব্যবস্থার আওতায় নির্বাহী বিভাগ নিম্ন আদালত, বিচার বিভাগীয় লোকবল নিয়োগ এবং ওই বিভাগের কর্মীদের বেতন ভাতাদি নিয়ন্ত্রণ করত। ২০০৭ সালে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয় এবং এই আইন আলোচ্য বছরে কার্যকর ছিল।

দৃশ্যত নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা হলেও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের নিয়োগদান করে এবং সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের জামিন ও আটকের সিদ্ধান্তসহ রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর বিভিন্ন মামলায় বিচারপতিদের অনেক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অক্টোবরের ২০ তারিখে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ১০ জন অতিরিক্ত বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করেন। বিচারকদের রাজনৈতিক পরিচয়ের ব্যাপারে অভিযোগের কারণে সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন বিচারকদের প্রথাগত নিয়োগদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে ।

সারা বছর জুড়েই প্রেসিডেন্ট জিল-ুর রহমান পূর্ববর্তী সরকারের অধীনে দায়ের করা মামলার আসামিদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন। সরকার এইসব মামলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে করে। আওয়ামী লীগের সাথে সংশি-ষ্ট ব্যক্তিরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ক্ষমা পান এবং অনেক ক্ষেত্রেই সুশীল সমাজ এ ধরনের ক্ষমার ব্যাপক সমালোচনা করে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানায়, যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের পক্ষের আইনজীবীরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ভয়ভীতি প্রদর্শনের শিকার হয়েছেন।

দুর্নীতি এবং মামলার ব্যাপক জট দেশের বিচার ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত করেছে। বিচারে সাধারণত দীর্ঘসূত্রিতা ঘটে। সাক্ষীদের প্রভাবিত করা, ভুক্তভোগীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করা এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ গায়েব হয়ে যাওয়ার কারণে বিবাদীর ন্যায় বিচারপ্রাপ্তি বিঘ্নিত হয়। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার পর্যবেক্ষকরা জানান, ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী এবং আদালতের কর্মীরা আলোচ্য বছরে দায়ের করা অনেক মামলার বিবাদীদের কাছ থেকে ঘুষ দাবি করেছেন।

বিচার প্রক্রিয়া

আইনে বলা আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার পক্ষে উকিল নিয়োগ করতে, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ পর্যালোচনা করতে, সাক্ষীকে ডেকে প্রশ্ন করতে এবং তার বিরুদ্ধে দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন। জুরিরা নয়, মামলার বিচার বিচারকরাই করে থাকেন। বিচারকার্য হয় প্রকাশ্যে। রাষ্ট্র খুব কম ক্ষেত্রেই অভিযুক্তের জন্য রাষ্ট্রীয় আইনজীবী নিয়োগ করেছে। বিবাদীকে নির্দোষ বলেই ধরে নেয়া হয়, রায়ের বিরুদ্ধে তাদের আপিল করার অধিকার আছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সরকারের কি প্রমাণাদি আছে তা দেখার অধিকারও তাদের আছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মতে, যাদেরকে বিচারের জন্য আনা হয় তাদের ৯০ শতাংশই শেষ পর্যন্ত দোষী সাব্যস্ত হয় না।

রাজনৈতিক বন্দী ও আটক ব্যক্তি

আলোচ্য বছরেও সরকার আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে" দায়ের করা বলে অভিযুক্ত মামলাগুলো শনাক্ত ও প্রত্যাহার করার কাজ অব্যাহত রাখে। প্রাথমিকভাবে দেখা গেছে প্রত্যাহারের জন্য সুপারিশ করা মামলাগুলির বেশিরভাগই আওয়ামী লীগ সদস্যদের বিরুদ্ধে দায়ের করা। বিরোধী দলের সদস্যদের গ্রেফতার ও দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা অনেকসময় একটি বিবেচ্য বিষয় হলেও কেবল রাজনৈতিক কারণে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি।

দেওয়ানি বিচার ও প্রতিকার পদ্ধতি

ত্রুটি শুধরাবার জন্য প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে। আলোচ্য বছরে সরকার দেওয়ানি বিচার ব্যবস্থায় কোন হস্তক্ষেপ করেনি। দুর্নীতি এবং বাইরের প্রভাব দেওয়ানি বিচার ব্যবস্থায় একটি সমস্যা হিসেবে ছিল। জনগণ তাদের অভিযোগ মধ্যস্থতার জন্য বিকল্প বিবাদ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারেন। সরকারি সূত্র মতে, দেওয়ানি মামলায় মধ্যস্থতার ব্যাপকতর ব্যবহারের ফলে বিচার প্রদান দ্রুততর হয়েছে, তবে এই ব্যবস্থা কতটা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে তার কোন মূল্যায়ন করা হয়নি। ব্যক্তির ও সংগঠনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে দেওয়ানি আদালতের কাছে প্রতিকার চাওয়ার অধিকার আছে। তবে দেওয়ানি আদালত ব্যবস্থা শ্রথ ও ঝামেলাপূর্ণ হবার কারণে অনেকেই সেখানে মামলা দায়ের করতে যায় না।

সম্পত্তি প্রত্যর্পণ

সরকার বিভিন্ন ব্যক্তি, বিশেষত হিন্দুদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না যারা ১৯৭৪ সালের শত্রু সম্পদ আইনের কারণে তাদের জমিজমা হারিয়ে ছিল, যদিও ২০০১ সালে আইনে পরিবর্তন আনার কারণে তাদেরকে জমি ফিরিয়ে দেয়ার কথা রয়েছে। (সেকশন ২.ঘ. দেখুন।)

চ. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বাড়িঘর বা যোগাযোগের গোপনীয়তায় যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ

প্রচলিত আইনে গোয়েন্দা বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহীর অনুমতি নিয়ে যে কারো ব্যক্তিগত যোগাযোগের ওপর নজরদারি করতে পারেন।

গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, সরকার ২০০৮ সালে ফোন বার্তা গোপনে মনিটর করা ও শোনার কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় মনিটরিং কেন্দ্র খোলে। গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো অভিযোগ করে যে, আলোচ্য বছরে সরকার ফোনে অবৈধ আড়িপাতার কাজ অব্যাহত রেখেছিল। আবশ্যকতা অনুযায়ী পুলিশ খুব কমই পরোয়ানা ব্যবহার করেছে, আর যেসব পুলিশ কর্মকর্তা এসব নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়েছে তাদেরকে কোন শাস্তি দেয়া হয়নি। মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানায়, পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) সংস্থা এবং প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) সরকারের সমালোচক ব্যক্তি হিসেবে গণ্য ব্যক্তিদের ওপর নজরদারি ও রিপোর্ট করার জন্য তথ্যসংগ্রাহক নিয়োগ করে। সরকার নিয়মিতভাবে বিরোধীদলের রাজনীতিবিদদের ওপরও নজরদারি চালায়। মানবাধিকার সংস্থা ও সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুসারে পুলিশ অনেক সময় যথাযথ অনুমোদন ছাড়াই ব্যক্তিগত বাড়িঘরে প্রবেশ করেছে।

সেকশন ২ নিম্নলিখিত অধিকারগুলোসহ নাগরিক অধিকারের প্রতি সম্মান

ক. বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অবস্থা

সংবিধানে বাক স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা উলে-খ আছে, তবে বাস্তবে সরকার প্রায়শই এসব অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে।

বাক স্বাধীনতা: সংসদে জুলাই মাসে পাস হওয়া সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীতে সংবিধানের সমালোচনাকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল বলে অভিহিত করা হয়েছে। দণ্ডবিধির অধীনে রাষ্ট্রদ্রোহীতার শাস্তি তিন বছর থেকে

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে এবং এ বছর যেসব বিরোধী দলীয় নেতা এ ধরনের সমালোচনাধর্মী মন্তব্য করেছেন তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা: দেশে শত শত স্বাধীন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকা ও প্রকাশনা রয়েছে। যেসব পত্রপত্রিকা সরকারের সমালোচনা করেছে তাদের ওপর সরকারি চাপ এসেছিল। সরকারি মালিকানাধীন একটি বার্তা সংস্থা ছাড়াও আরো দুটি বেসরকারি বার্তা সংস্থা আছে। ২০১০ সালে 'রিপোর্টার ইউথআউট বর্ডারস' দেশটির সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ইতিমধ্যেই সীমিত মাত্রাটি আরো খানিকটা নিচে নেমে গেছে বলে উলে-খ করেছে। ফ্রিডম হাউজের ২০১০ সালের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম কেবল আংশিকভাবে স্বাধীন বলে উলে-খ করা হয়েছে।

সরকারি মালিকানাধীনে একটি বেতার এবং একটি টেলিভিশন কেন্দ্র রয়েছে। জাতীয় সংসদ এই মর্মে আইন পাশ করে যে, সরকারি টেলিভিশন কেন্দ্র বিটিভি দেশের একমাত্র টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার সুবিধার আওতায় থাকবে। দেশটির প্রায় ৬০ ভাগ মানুষ এখনও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের আওতার বাইরে আছেন এবং সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে প্রায় ৮০ শতাংশ নাগরিক টেলিভিশন থেকে তথ্য পেয়ে থাকে। বিটিভি সংসদ অধিবেশন এবং সরকারের কর্মসূচিগুলো প্রচার করে থাকে, তবে খুব কম ক্ষেত্রেই বিরোধীদলের মতামত প্রচার করে। ক্যাবল অপারেটরেরা সাধারণত সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সরকার সকল বেসরকারি চ্যানেলকে বিনামূল্যে নির্বাচিত সরকারি সংবাদ অনুষ্ঠান এবং প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রচার করার জন্য শর্তারোপ করে।

২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর আওয়ামী লীগ সরকার দুটি টেলিভিশন চ্যানেল বন্ধ করে দেয়। এগুলো হল চ্যানেল ওয়ান এবং যমুনা টিভি। বছরের শেষ পর্যন্ত উভয় টিভির প্রচারই বন্ধ ছিল।

সরকার রাজনৈতিক সমর্থকদের টেলিভিশন চ্যানেল খোলার জন্য নতুন লাইসেন্স প্রদান করে এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নতুন লাইসেন্স প্রদান করতে অস্বীকার করে। কেবল আওয়ামী লীগ নয় অতীতের সরকারগুলোও তাই করেছে।

সহিংসতা ও হয়রানি: সাংবাদিকদের ওপর হামলা একটি সমস্যা হিসেবে অব্যাহত থাকে। সরকার বা ক্ষমতাসীন দলের সাথে সংশি-ষ্ট লোকদের হাতে হয়রানি, গ্রেফতার ও মারধরের শিকার সাংবাদিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অধিকার এবং গণমাধ্যম নজরদারি সংস্থাগুলো জানায়, আলোচ্য বছরে কমপক্ষে একজন সাংবাদিক নিহত, ১৩৯ জন আহত, একজন গ্রেফতার হন, ৪৩ জন প্রহৃত হন এবং ৫৩ জনকে হুমকি প্রদান করা হয়। এছাড়া সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ২৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সরকার সাংবাদিকদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদান করেনি।

সরকারের সমালোচক এবং বিরোধীদলের সাথে সংশি-ষ্টতা আছে এমন সাংবাদিকরা নিরাপত্তা বাহিনীর কোনো কোনো অনির্ধারিত শাখার দ্বারা এবং ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের হাতে হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন। যেমন, মে মাসের ২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারেক আহমেদ সিদ্দিক এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ঘোষণা করেন যে সরকারের কাছে প্রমাণ রয়েছে যে একটি জাতীয় দৈনিকের

স্বনামধন্য সম্পাদকের সাথে ইসলামি জঙ্গিদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে এবং সরকার যদি চায় তাহলে সম্পাদককে গ্রেফতার করতে পারে। সিদ্দিক সম্পাদকের নাম উলে-খ করেননি এবং কেউ গ্রেফতার হয়নি।

জুলাইয়ের ৩১ তারিখে, কর্তৃপক্ষ অনলাইন সংবাদ মাধ্যম শীর্ষনিউজের সম্পাদক একরামুল হককে চাঁদাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করে যেটিকে অনেকেই সাজানো অভিযোগ বলে বিশ্বাস করেন। হক সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দুর্নীতির ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করায় প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এটি করা হয়। কর্তৃপক্ষ শীর্ষনিউজের সাংবাদিকদের পরিচয়পত্র বাতিল করে, যার ফলে কোন সরকারি অনুষ্ঠানের খবর প্রচার করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং সংবাদ সংস্থাটিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য করে। হক জামিনে ছাড়া পায়, কিন্তু বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত মামলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়।

সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখে ঢাকায় র‍্যাবের সদস্যরা বাংলাভিশনের একজন সম্প্রচার ইঞ্জিনিয়ারকে মারধর করে। র‍্যাবের কর্মকর্তারা সম্প্রচারের যন্ত্রপাতিও নষ্ট করে। মারধরের কারণ ছিল স্পষ্ট ছিল না। তবে পরবর্তীতে র‍্যাবের কর্মকর্তারা বাংলাভিশনের কাছে ক্ষমা চায় এবং দায়ী কর্মকর্তাদের বদলি করে।

পত্রপত্রিকা ও মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে জুনের ৩ তারিখে খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়া জেলার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আলী হোসেনের ঘনিষ্ট একদল কর্মী প্রথম আলোর স্থানীয় প্রতিনিধি তৌহিদ হাসান, আরটিভি'র স্থানীয় প্রতিনিধি শেখ বেলাল হোসেন, একুশে টিভির স্থানীয় প্রতিনিধি জহিরুল ইসলাম, এবং একুশে টিভির এক ক্যামেরাম্যান আহমেদ সজীবের ওপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে আহত করে। এ হামলার পর হাসানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সাংবাদিকবৃন্দ স্থানীয় সরকারের টেন্ডারের ক্ষেত্রে অনিয়ম এবং বৈষম্য অনুসন্ধান করে দেখছিল।

সেন্সরশীপ বা বিষয়বস্তুর ওপর নিষেধাজ্ঞা: কিছু সাংবাদিক ও বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থার মতে (এনজিও), সরকারি প্রতিহিংসার ভয়ে সাংবাদিকরা সংবাদ প্রচারে স্ব-উদ্যোগী হয়ে সংযমী ছিলেন। প্রকাশ্যে সরকারের সমালোচনা হরহামেশা হয়ে থাকলেও গণমাধ্যম, বিশেষ করে পত্রিকাগুলো তাদের আয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশের জন্য সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল। তাই পত্রপত্রিকাগুলোর নিজে থেকেই সেন্সরশিপ আরোপ করার জোরালো কারণ রয়েছে ।

আলোচ্য বছরে সরকার বিদেশী প্রকাশনা ও চলচ্চিত্র কঠোরভাবে পর্যালোচনা ও সেন্সরের আওতায় আনেনি। সরকার পরিচালিত একটি সেন্সর বোর্ড দেশী ও বিদেশী চলচ্চিত্র পর্যালোচনা করেছে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার প্রতি হুমকি, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতদান, অশ-ীলতা, বিদেশের সাথে সম্পর্ক নষ্ট, মানহানি, নকল বা চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদি কারণে যে কোনো চলচ্চিত্র সেন্সর করার বা নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা এই বোর্ডের ছিল। তবে পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত ততটা কড়াকড়ি ছিল না। বস্তুত, ভিডিও ও ডিভিডি ভাড়া দেয় এমন দোকানগুলোয় নানা ধরনের চলচ্চিত্র পাওয়া যায়। এসব দোকানে ভিডিও ও ডিভিডি ভাড়াদানে নিয়ন্ত্রণ আরোপে সরকারি চেষ্টা ছিল বিচ্ছিন্ন ও অকার্যকর।

এজেন্স ফ্রেন্স-প্রেস রির্পোট থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড শাসক দলের কর্মকর্তাদের নিয়ে তামাশা করা হয়েছে এই অভিযোগে জুলাই মাসে হৃদয় ভাঙ্গা ঢেউ নামের এক সিনেমাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

সেন্সর বোর্ডের সদস্যরা একটি উক্তি চিহ্নিত করে, যা স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবর রহমানকে বোঝানোর জন্য অনেকসময় বলা হয়, তা সিনেমাটির খলনায়কের মুখে বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়। একে সেন্সরবোর্ড শ্রুটিকটু বিষয় হিসেবে বলেছে। তবে ছবিটি শেষ পর্যন্ত মুক্তি পায়।

উগ্র বা অশ-ীল ছবি, ইসলামকে ভ্রান্ত বা অবমাননাকরভাবে উত্থাপন বা জাতীয় নেতাদের সম্পর্কে আপত্তিকর উক্তির জন্যই কেবল খুব ক্ষেত্রেই সরকার সেন্সরশিপ আরোপ করেছে।

ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতা

যদিও যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ইন্টানেটের মাধ্যমে মতামত প্রকাশ করতে পেরেছেন, তবুও মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানিয়েছে যে, সরকার ইন্টারনেট যোগাযোগের ওপর অব্যাহতভাবে নজরদারি করেছে। সরকার জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেইসবুকে কিছু পৃষ্ঠা যেমন হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং কিছু পৃষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতার সমালোচনা রয়েছে সেসব বন্ধ করা হয়। বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে, নিরাপত্তা বাহিনী তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে শনাক্ত করা যায় এমন সব তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। তবে কোন স্বাধীন সূত্র থেকে এর সত্যতা যাচাই সম্ভব হয়নি।

শিক্ষার স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রের স্বাধীনতা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার স্বাধীনতা খর্ব করেনি। তবে গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, কর্তৃপক্ষ সংবেদনশীল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়াদির ওপর গবেষণা কাজ নিরুৎসাহিত করেছে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ঢাকা ইউনির্ভাসিটির বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষককে, যাদের মধ্যে কিছু বিএনপি পন্থী শিক্ষক রয়েছে, অব্যাহতি দেয়া হয়েছে বা দীর্ঘ ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। তবে সংশি-ষ্ট শিক্ষকদের তাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার জন্য লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে কি না তা স্পষ্ট নয়।

খ. শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা

সংবিধানে সভা-সমাবেশ ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সরকার সাধারণভাবে এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। তবে কোন কোন সময় সরকার সভা-সমাবেশ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে।

সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতা

সরকার সাধারণত সমাবেশ করার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধীদের সভা বা বিক্ষোভ অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা প্রয়োগ করেছেন। এই ধারা প্রশাসনকে চারজনের অধিক ব্যক্তির সমাবেশ নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা দিয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র জানায়, আলোচ্য বছরে সরকার কমপক্ষে **১৩৩**টি

বার এই বিধি প্রয়োগ করেছে। কোন কোন সময় পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা শক্তি প্রয়োগ করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে।

ঢাকার কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় যানচলাচলের সমস্যাকে দেখিয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশ ২০১০ সালে ছাত্র বিক্ষোভের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যা ২০১১ সালেও কার্যকর ছিল। এ নিষেধাজ্ঞা কেবল কিছু নির্বাচিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। পুলিশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিক্ষোভের সময় অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার করে।

ইসলামপন্থী দল জামায়াতে ইসলামী জানায়, সারা বছরই সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের জন্য অনুমতি পেতে তাদেরকে তীব্র বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা

নৈতিকতা ও জনশৃঙ্খলার স্বার্থে "যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ" সাপেক্ষে আইনে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্ঘবদ্ধ হবার অধিকারের কথা বলা আছে। সরকার সাধারণভাবে এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। যে কোন ব্যক্তি তার ইচ্ছা মাফিক কোন দল বা গোষ্ঠীতে যোগ দিতে পেরেছে। আলোচ্য বছরে ট্রেড ইউনিয়নগুলো তাদের নিয়মিত কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পেরেছে। তবে আইনের কারণে বেশ কিছু খাতে, যেমন তৈরি পোশাক শিল্পে, নতুন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

গ. ধর্মীয় স্বাধীনতা

ধর্মীয় স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জানতে www.state.gov/j/drl/irf/rpt. ওয়েবসাইটে *আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদন* দেখুন।

ঘ. চলাফেরার স্বাধীনতা, অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তচ্যুত ব্যক্তি, শরণার্থীদের সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি

আইন দেশের ভেতরে চলাফেরা করার, বিদেশ ভ্রমণের, বিদেশী নাগরিত্ব নিয়ে বিদেশ যাবার এবং বিদেশ থেকে দেশে প্রত্যাবাসিত হওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে। কয়েকজন বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা ছাড়া সরকার সাধারণত এসব আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল।

<u>বিদেশে ভ্রমণ:</u> সরকার ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এ উদ্দেশ্যে সরকার সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধীদের আন্তর্জাতিক ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যাদের অধিকাংশই বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দ। এইসব সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাদের পাসপোর্ট নিয়ে নেওয়া হয়নি, তবে ঢাকা বিমানবন্দরের অভিবাসন কর্মকর্তারা বিরোধীদল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিবিদদের বিভিন্ন সময়ে দেশ ত্যাগে বাধা দিয়েছে। যেমন, জুনের প্রথমদিকে বিএনপির সিনিয়র নেতা গিয়াসুদ্দিন কাদের চৌধুরীকে এক বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয়, যদিও আদালতের আদেশে তাকে ভ্রমণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। চৌধুরী

চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভ্রমণের অনুমতি চেয়ে সরকারের কাছে যে আবেদন করেছে বছরের শেষ নাগাদও তার কোন মীমাংসা হয়নি। কয়েকজন রাজনীতিবিদ তাদের বিদেশ ভ্রমণের ওপর আরোপিত অঘোষিত এই বিধিনিষেধ সফলভাবে চ্যালেঞ্জ করেন এবং বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে আবার দেশে ফিরে আসেন।

বাংলাদেশের পাসপোর্টে ইসরাইল ভ্রমণ অনুমোদন করে না।

অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি

আন্তর্জাতিক বাস্তুচ্যুতি নজরদারি কেন্দ্রের (আইডিএমসি) ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, ১৯৭৩ সালে তৎকালীন সরকার আদিবাসী জুম্মু জাতিগোষ্ঠীর অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের দাবির বিরোধিতা করায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। সত্তর ও আশির দশকে এ সংঘাতের সময় সরকার সমতলের ভূমিহীন বাঙালিদের সেখানে পুনর্বাসিত করে যাতে পাবর্ত্য চট্টগ্রামে জুম্মুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। এ সময়ে সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট বসতিস্থাপনকারীদের সাথে সংঘর্ষে হাজার হাজার জুম্মু অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়।

পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের (আইডিপি) সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ২০০০ সালে সরকারের একটি টাস্কফোর্স বাস্তুচ্যুতদের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ বলে উলে-খ করে, কিন্তু তারা তাদের গণনায় আদিবাসী নয় এমন ব্যক্তিদেরকেও ধরেছে। একই বছর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানায়, আইডিপির সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। সংস্থাটি এতে আদিবাসী বহির্ভূত লোকদের সংখ্যা গণনা করেনি। ২০০৮ সালে সরকার সংঘাতের সময় যারা তাদের জমিজমা হরিয়েছে তাদের সাহায্য ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের অঙ্গীকার করে। ফিরে আসা জুম্মু অভ্যন্ত রীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনের জন্য এবং সামরিক শিবিরগুলো তুলে ফেলতে একটি কমিশন ও টাস্কফোর্স গঠন করে। আন্তর্জাতিক বাস্তুচ্যুতি নজরদারি কেন্দ্রের মতে, ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তখনও প্রায় ৩০০টি সামরিক শিবির ছিল এবং তহবিল ও জনবলের অভাবে ভূমি কমিশন ও টাস্কফোর্সের কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল।

আন্তর্জাতিক বাস্তুচ্যুতি নজরদারি কেন্দ্র (আইডিএমসি) আরো জানায় যে, বৈষম্যমূলক আইনের কারণে সারা দেশে হয়ত "এর চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সদস্যকে" "জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত" করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায় তাদের অধিকাংশ জমি হারায়। এ আইনের আওতায় সরকার যেসব ব্যক্তিকে "রাষ্ট্রের শত্রু" মনে করেছে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার কর্তৃত্ব লাভ করে। আইডিএমসির হিসাব অনুসারে, প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ হিন্দু পরিবার তাদের কৃষিজমির মালিকানা হারিয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসব অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুদের প্রতি আচরণের ব্যাপারে পদ্ধতিগত কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ হয়নি।

নভেম্বরের ২৮ তারিখে সংসদ অর্পিত সম্পত্তি প্রর্তপণ (সংশোধনী) বিল পাস করে। এতে জমি ফেরত দেয়ার জন্য জেলা পর্যায়ে বাস্তুচ্যুতির তালিকা প্রস্তুত করতে আদেশ দেয়া হয়। প্রকৃত অর্পিত সম্পদ প্রর্ত্যপণ বিল পাস

হয়েছিল ২০০১ সালে কিন্তু এর মধ্যবর্তী সময়ে এটি আর বাস্তবায়িত হয়নি। ভূমি মন্ত্রী রেজাউল করিম হিরা বলেন যে জমি ফেরতদানের প্রচেষ্টা পুনরায় শুরু করার জন্য বিলটি সংশোধন করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সীমিত শারীরিক নিরাপত্তা রয়েছে। আইডিএমসি জানায় এক প্রশাসনিক আদেশের বলে সেনাবাহিনী এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের বেসামরিক প্রশাসনের ওপর কর্তৃত্ব করছে এবং সেখানকার অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিরা যথেচ্ছ গ্রেফতার, বেআইনী আটক, নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা এবং ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হচ্ছে বলে অনেক খবর পাওয়া যাচ্ছে (সেকশন ৬ দেখুন)। আইডিএমসি জানায়, বেশ কিছু সংবাদে দেখা গেছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় বসতিস্থাপনকারীরা আদিবাসীদের অধিকার লঙ্ঘনের এইসব ঘটনা "নিয়মতান্ত্রিকভাবেই" ঘটিয়ে থাকে।

২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাঘাইহাটের অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত আদিবাসীদের ২০০ বেশি ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনার হোতাদের শাস্তিদানের বিষয়ে সরকারের কোন পদক্ষেপ ছিল না। এ ঘটনায় দুজন ব্যক্তি নিহত হয় ও বেশ কয়েকজন আহত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর আদালতে যাওয়ার ও আইনি সুবিধা লাভের সুযোগও কম। আন্তর্জাতিক বাস্তুচ্যুতি নজরদারি কেন্দ্র জানায় যে, "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন দেখতে পায় যে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার মত আইনজীবী ও তথ্যের অভাবে তাদের ন্যায়বিচার পাবার পথ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার, গণতন্ত্র, অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন এবং ভূমির অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার উন্নয়ন ঘটাতে বাংলাদেশ ও দেশের বাইরের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়েছে।"

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সহায়তায় পরিচালিত 'পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের ভূমি বিচ্ছিন্নতা' শীর্ষক ২০১১ সালের এক সমীক্ষায় আদিবাসী সম্প্রদায়কে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত করার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সমীক্ষার মতে, মিথ্যা নামজারি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, শক্তি প্রয়োগ, প্রতারণা এবং সরকারের জমির দাবিকে ব্যবহার করে আদিবাসীদের ভূমি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নিয়ে নেয়া হয়।

শরণার্থীদের সুরক্ষা

<u>রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের সুযোগ:</u> দেশে এ বিষয়ে জাতীয় কোন আইন না থাকায় শরণার্থীদের রাজনৈতিক আশ্রয়দান কিংবা তাদেরকে মর্যাদাদানের আইনগত কোন কাঠামো নাই। শরণার্থীদের সুরক্ষা প্রদানের কোন ব্যবস্থাও সরকার প্রবর্তন করেনি। কিন্তু বাস্তবে সরকার সেসব শরণার্থীদের বহিষ্কার বা দেশে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে কিছু কিছু সুরক্ষা দিয়েছে যাদের জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম, জাতীয়তা বা বিশেষ কোন সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য বা বিশেষ রাজনৈতিক মতের কারণে তাদের নিজেদের দেশে হুমকিগ্রস্ত। সরকার শরণার্থীদের সুরক্ষা ও সহায়তাদানে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারের (ইউএনএইচসিআর) অফিসের সাথে ও অন্যান্য মানবহিতৈষী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করেছে। তবে সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

অনুমোদনে বিলম্ব করায় দেশে এনজিওগুলোর কার্যক্রম চালিয়ে যাবার অনুমতি পেতে ও সাহায্য কর্মসূচি বাস্ত বায়নে বিলম্ব হচ্ছে।

সরকারি হিসেব মতে, কক্সবাজার ও টেকনাফের আশেপাশের এলাকায় স্থানীয় জনগণের সাথে আরো প্রায় দুই থেকে পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী বসবাস করে যারা শরণার্থী হিসেবে সরকারিভাবে স্বীকৃত নয়। এদের মধ্যে ২০ হাজার রোহিঙ্গা কুতুপালং সরকারি শরণার্থী শিবিরের কাছাকাছি একটি বেসরকারি শিবিরে বাস করে। আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিভাবে অনিবন্ধিত শরণার্থী ও তাদেরকে আশ্রয়দানকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করতে পারে না। কেননা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এ ধরনের প্রকল্পে অনুমোদন দিতে রাজি হয় না। আলোচ্য বছরে রোহিঙ্গাদের কোনো প্রত্যাবাসন হয়নি। ২০১০ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার শরণার্থী নীতি পর্যালোচনা করবে বলে ইউএনএইচসিআর-এর পুর্নবাসন কর্মসূচি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয় । সেটি এখনো শুরু হয়নি। বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত কোন শরণার্থী নীতি প্রদান করা হয়নি এবং পুর্নবাসনও বন্ধ রয়েছে।

সরকার ইউএনএইচসিআর-এর সাথে একযোগে কাজ করে দুইটি সরকারি শরণার্থী শিবিরের প্রায় ২৯ হাজার নিবন্ধিত শরণার্থীকে অস্থায়ী সুরক্ষা দিয়েছে। এছাড়া ইউএনএইচসিআর যেসব স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর সাক্ষাৎকার নিয়ে তাদেরকে শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার তাদেরও অস্থায়ী সুরক্ষা দিয়েছে। সরকারের নিবন্ধিত শরণার্থীদের তালিকা এবং ইউএনএইচসিআর-এর তালিকার মধ্যে কিছুটা অমিল রয়েছে। এইসব অমিল দূর করার জন্য ২০১০ সালের শুরু থেকে ইউএনএইচসিআর সরকারের সাথে একটি মতৈক্য প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে। এই যৌথ অনুশীলন শেষ হয়ে এসেছে । এতে ৬৯১৫ জন ব্যক্তির সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এরা শরণার্থী শিবিরে বসবাস করছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা সরকারিভাবে স্বীকৃত শরণার্থীদের একান্নবর্তী পরিবারের অংশ। ইউএনএইচসিআর এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ২৮০০ বেশি শরণার্থীকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছালেও সরকারের অন্যান্য জায়গায় এগুলোর আনুষ্ঠানিক বাস্তবায়ন আটকে রয়েছে।

<u>নন-রিফলমো:</u> বার্মা থেকে আসা রোহিঙ্গাদের রাজনৈতিক আশ্রয়দানে বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে এসেছে। সরকার এসব শরণার্থীকে অবৈধ অর্থনৈতিক অভিবাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের অনেককেই সীমান্ত থেকেই আবার বার্মায় ফেরত পাঠিয়েছে। তবে সীমান্তের এলাকাই এমন যে তা দিয়ে লোকজন সহজে এপার-ওপার করতে পারে, আর সে কারণে অভিবাসন ঠেকানো সম্ভব হয়নি। কত লোক সীমান্তের এপার-ওপার করছে তার প্রকৃত হিসাব জানা যায় না। সরকার দাবি করে যে, বাংলাদেশে "শরণার্থীদের গ্রহণ" করার কারণে এখানে উলে-খযোগ্য শরণার্থী প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে, তবে এ দাবির সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি পাওয়া যায়নি। ইউএনএইচসিআর-এর উভয় দেশেই মাঠ পর্যায়ে উপস্থিতি রয়েছে এবং এটি সীমান্ত পারাপারের গতি প্রকৃতি নজরদারির চেষ্টা করছে। সংস্থাটি স্বীকার করেছে যে ব্যবসা ও চোরাচালানের জন্য বেশ কিছু মানুষ সীমান্ত পারাপার করে। তবে ইউএনএইচসিআর উলে-খযোগ্য সংখ্যক শরণার্থীর প্রবাহ বা বাংলাদেশে পালিয়ে আসার কোন প্রমাণ পায়নি। ইউএনএইচসিআর-এর মতে কিছু ব্যক্তি যারা স্বেচ্ছায় ফেরত এসেছে তারা শরণার্থী মর্যাদা পাবার অধিকারী। ইউএনএইচসিআর-এর শরণার্থী শিবিরের কিছু অনিবন্ধিত ব্যক্তি ৯০ দশকের মাঝামাঝি বার্মায় সরকারিভাবে তাদের প্রত্যাবাসনের পর অবৈধভাবে এ দেশে ফিরে আসে। বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় পুলিশ অনিবন্ধিত ব্যক্তিদের শিবিরের বাইরে আটক করে এবং বিদেশী সংক্রান্ত আইনের অধীনে কারাগারে প্রেরণ করে। সংশি-ষ্ট রোহিঙ্গাকে বার্মিজ বলে সনাক্ত করার ক্ষেত্রে বার্মার সরকারের অনিচ্ছার কারণে বন্দী অনিবন্ধিত

রোহিঙ্গার মুক্তি পাওয়া বাধাগ্রস্থ হয়, তাদের পুনর্বাসনও বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তারা কার্যত রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

শরণার্থীদের নিপীড়ন: ইউএনএইচসিআরের মতে, শরণার্থীদের ওপর নানা রকম নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। যেমন, ধর্ষণ, মারধর, পারিবারিক নির্যাতন, খাবারের বঞ্চনা, যথেচ্ছ আটক রাখার এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যোগাড় করার সমস্যা। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলোর পয়ঃনিষ্কাশন, পুষ্টিমান এবং বাসস্থানের মান আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের নিচে নেমে গেছে বলে সাম্প্রতিক বছরগুলোর রিপোর্টের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ইউএনএইচসিআর-এর সঙ্গে সরকারি শরণার্থী শিবিরগুলোর মান উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছে। সরকার ইউএনএইচসিআরকে শিবিরের কিছু ঘর ও শৌচাগার প্রতিস্থাপনের এবং আরো অধিক সংখ্যক এনজিওকে শরণার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দান এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন।

মৌলিক সেবা লাভের সুযোগ: সরকারি শিবিরগুলোতে সেবা ও অবকাঠামোর ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি ঘটলেও কিছু মৌলিক মান পূরণ হয়নি এবং জনসংখ্যার চাপ বিদ্যমান রয়েছে। এখানকার জনসংখ্যার ঘনত্ব এ দেশের শহরের বস্তিগুলোর মতই।

শিবিরের বাইরে শরণার্থীদের চলাচলের সীমিত স্বাধীনতা রয়েছে এবং শিবিরের বাইরে যেকোন ধরনের চলাচলের জন্য তারা অনুমতি নেবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। শিবিরে মোবাইল ফোন রাখা নিষিদ্ধ এবং ছোট আকারের দোকান বা চায়ের দোকান পরিচালনা শিবিরের কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাস্তবে স্থানীয় শিবির কর্তৃপক্ষ বিভিন্নভাবে আইনের প্রয়োগ করে। কখনো কখনো তারা কিছু নমনীয়তা ও সংযম প্রদর্শন করে, আবার কখনো তারা কঠোর পদক্ষেপ চাপিয়ে দেয়। এইসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কিছু শরণার্থী এ দেশের অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে খেটে খাওয়া শ্রমিক বা রিকশাচালকের কাজ করে এবং স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী গৃহশিক্ষকের সহায়তায় লেখাপড়া করে এবং হাই স্কুল পর্যন্ত সারা দেশে স্কুলের যেসব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাতে অংশগ্রহণ করে।

আগের বছরগুলোর মত সরকার এ বছরও বার্মা ফিরতে অপারগ রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে স্থানীয়ভাবে কাজ করার অনুমতি দেয়ার, চিকিৎসা সুযোগ দেয়ার অথবা শিবিরের বাইরে লেখাপড়া করার সুযোগ দেয়ার জন্য ইউএনএইচসিআরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। সরকার জাতিসংঘ শিশু তহবিল ইউনিসেফকে শিবিরে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল চালাবার অনুমতি দিতে শুরু করেছে। ইউএনএইচসিআর এবং অন্যান্য এনজিওর দেয়া মৌলিক সেবা সুবিধার কারণে আশেপাশের গ্রামে বসবাসকারী লোকদের চেয়ে নিবন্ধিত শরণার্থীরা অনেক সময় অপেক্ষাকৃত উন্নত চিকিৎসা সুবিধা পেয়েছে।
রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি

দুই থেকে পাঁচ লাখ শরণার্থী বর্তমানে রাষ্ট্রহীন অবস্থায় আছে। যদিও অনেকেই কোন বড় ধরনের সমস্যা ছাড়াই স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে একীভূত হয়ে গেছে।

সেকশন ৩ রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা: নাগরিকদের সরকার পরিবর্তন করার অধিকার

শান্তিপূর্ণ উপায়ে নাগরিকদের নিজ সরকার পরিবর্তন করার অধিকারের কথা সংবিধানে স্বীকৃত। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ এই অধিকার প্রয়োগ করেছে।

৩০ জুন বিরোধী দলের বয়কটের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সংসদ নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতাকে বাতিল করে সংবিধানের ১৫তম সংশোনী পাস করে। নির্বাচন ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগানো হতে পারে এরূপ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনের পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। মে মাসে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট যে রায়ের দেয় তার পর এ সংশোধনী আনা হয়।

১৫তম সংশোধনীর আওতায়, ২০১৩ সালের সাধারণ সংসদ নির্বাচন ও এর পরবর্তী সকল নির্বাচন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক সরকারের অধীন একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানাধীনে অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ ২০১৩ সালে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনেই নির্বাচন হবে। অনেক স্বাধীন পর্যবেক্ষক এই পরিবর্তনের সমালোচনা করে। কেননা যে কারণে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নির্বাচন ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা, সেই সমস্যার সমাধা করা হয়নি এবং এর ফলে সেটি আবার পুনর্জীবিত হবে, নির্বাচন ব্যবস্থা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার হবে। এটি সারা বছর জুড়েই রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য ব্যাপক উদ্বেগ ও মনোযোগের বস্তু ছিল।

জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন। এর মধ্যে ৩০০ জন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত, রাজনৈতিক দলগুলো নারী সদস্যদের মনোনয়ন দেয় সরাসরি নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্যদের মধ্যে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। অতিরিক্ত ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত যারা রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। দলীয় নেতারা দলের প্রার্থীদের নির্বাচনে মনোনয়ন দেন। অভিযোগ রয়েছে যে, বিত্তবান প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণার জন্য চাঁদা দিয়ে বা নেতাদের ব্যক্তিগতভাবে উপহার দিয়ে মনোনয়ন কিনতে পারেন।

সারা বছরজুড়েই বিরোধী দল সংসদ বয়কট অব্যাহত রাখে কিন্তু তাদের আসন ধরে রাখার জন্য নিয়ম পালন করতে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে সংসদে ফিরে আসে। সংসদে ফিরে আসার পূর্ব শর্ত হিসেবে তারা স্পিকার ও সরকার দলীয় সদস্যদের কাছ থেকে ন্যায়সঙ্গত আচরণ দাবি করে। সংসদ প্রথম অধিবেশনেই ৪৮টি স্থায়ী কমিটির সবগুলোই গঠন করে, যাতে বিরোধী দলের সদস্যদেরও অংশগ্রহণ রয়েছে। বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা সংসদ অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলেও স্থায়ী কমিটির বৈঠকে যোগদান অব্যাহত রাখেন।

নির্বাচন এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ

<u>সাম্প্রতিক নির্বাচন:</u>

২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী হন। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পর্যবেক্ষকরা এই নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট ৩০০টি আসনের মধ্যে ২২৯টিতে জয়ী হয়। হাসিনার মন্ত্রিসভায় জোটের অন্য শরিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সরকারের প্রধান হিসেবে শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদের স্থলাভিষিক্ত হন। বিএনপি চেয়ারপারসন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের নেতা হন।

২৭ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং হবিগঞ্জের দুটি আসনে যে উপনির্বাচন হয় তাতে বিচ্ছিন্ন সহিংসতা ও ব্যালট চুরির অভিযোগ পাওয়া যায়।

নারী ও সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ: দেশের আইন অনুযায়ী সংসদের ৩৪৫টি আসনের মধ্যে নারীরা যে কোন সংখ্যক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হতে পারেন, তবে নারীদের জন্য সংসদে ৪৫টি আসন সংরক্ষিত আছে। জুনের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে এই সংখ্যা ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৫০-এ উন্নীত করা হয়।

সংখ্যালঘুদের জন্য সংসদে পৃথক আসনের কোন বিধান ছিল না।

সেকশন ৪ সরকারে দুর্নীতি ও স্বচ্ছতা

সরকারি দুর্নীতির বিরুদ্ধে ফৌজদারি সাজার আইন রয়েছে। তবে সরকার এই আইন কার্যকারভাবে প্রয়োগ করেনি এবং সরকারি কর্মকর্তারা প্রায়শই শাস্তির ঊর্ধ্বে থেকে দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়েছেন। দুর্নীতি দমন কমিশন সরকারের একটি সংস্থা যা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের দায়িত্বে রয়েছে। ফেব্রুয়ারির ২৩ তারিখে সরকার একজন প্রাক্তন আমলা ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার হিসেবে নিয়োগদান করেন। উভয়ই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে পরিচিত। বিশ্বব্যাংকের ২০১০ সালের প্রতিবেদন অনুসারে সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্তৃত্ব হ্রাস করার চেষ্টা করছে এবং সারা দেশে দুর্নীতির বিচারকে ভীষণভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। প্রতিবেদনে বলা হয় বর্তমান সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তুলনায় অনেক কম দুর্নীতির মামলা দায়ের করেছে। এতে আরো বলা হয় যে, সরকারের একটি কমিশন দুর্নীতি দমন কমিশন যাতে শত শত দুর্নীতির মামলা তুলে নেয় সে বিষয়েও সুপারিশ করে। এসব মামলার অধিকাংশই আওয়ামী লীগের সদস্যদের বিরুদ্ধে দায়ের করা। সুশীল সমাজের সদস্যরা বলেন সরকার দুর্নীতি দমনের বিষয়ে আন্তরিক নয় এবং দুর্নীতি দমন কমিশনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দোষী সাবস্ত্য করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের মতে দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে এটি একটি "দন্তবিহীন বাঘে" পরিণত হয়েছে।

যেমন, আগস্টের ৮ তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশন সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও আরো তিনজনের বিরুদ্ধে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে একটি দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ আনে। বিরোধীদল বিএনপি এ অভিযোগকে "ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত" বলে আখ্যা দেয়।

জুনের ২৩ তারিখে ঢাকার একটি আদালত ২০০৯ সালে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা এক মামলায় বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোকে বিদেশে অর্থ পাচারের মামলায় ছয় বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়। খালেদা জিয়ার আরেক ছেলে তারেক রহমানের বিরুদ্ধেও আরেকটি পৃথক অর্থ পাচারের মামলা দায়ের করা হয়েছে। জামিনে উভয়ই বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত দেশের বাইরে অবস্থান করছিল। তবে দোষীসাব্যস্ত হওয়ার কারণে কোকো কার্যত ফেরারি আসামিতে পরিণত হয়েছে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত একটি পর্যালোচনা কমিটি ২০০৯ সালের পূর্বে সরকার ও দুর্নীতি দমন কমিশন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যেসব মামলা দায়ের করেছিল সেগুলো প্রত্যাহারের সুপারিশ করে। এই কমিটি প্রধানত আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মোট ১,৮১৭ টি মামলা তুলে নেয়ার সুপারিশ করে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল মামলাও আছে। অন্য যেসব মামলা তুলে নেয়ার সুপারিশ করা হয় তার মধ্যে আছে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমান, বিএনপি নেতা ও সাবেক আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ এবং জাতীয় পার্টির মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদারের বিরুদ্ধে আনীত একটি করে মামলা। মওদুদ আহমদ তার বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার করে নেয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং খালেদা জিয়া ও তার সন্তানদ্বয়ের বিরুদ্ধে আনীত মামলাসহ বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দায়ের করা সকল মামলা প্রত্যাহার করে নেয়ার দাবি জানান।

সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখে এক সংবাদ সম্মেলনে দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক জেনারেল ফারুক আহমেদ ঘোষণা করেন যে দুর্নীতিতে সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করে দুর্নীতির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ ফেরত দেয়ার কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন (টিএসি) যাদেরকে রেহাই দিয়েছিল সেই ৪৪৮ জন ব্যক্তির সকলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন পদক্ষেপ নিচ্ছে। টিএসি'কে অবৈধ ও এর সিদ্ধান্তকে বাতিল ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া এক রায়ের পর টিএসি'র কাছ থেকে সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

পুলিশের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। পুলিশের মহাপরিদর্শক পুলিশের প্রশিক্ষণ, দুর্নীতি দমন ও এই বাহিনীকে আরো সংবেদনশীল করে গড়ে তোলার জন্য আন্তর্জাতিক দাতাদের আংশিক অর্থায়নে নতুন কৌশলের বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখেন। পুলিশ বাহিনীর দুর্নীতির ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে কোন মূল্যায়ন পাওয়া যায়নি।

বিচার বিভাগের ওপর সরকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক চাপ ছিল এবং বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে যেসব মামলা ছিল সেগুলো অনেকসময় অস্বাভাবিক পন্থায় এগোয়। আপিল বিভাগ বেশকিছু মামলায় বিরোধী দলের উচ্চ পর্যায়ের সন্দেহভাজন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে জামিন দেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়।

বিচার বিভাগে দুর্নীতি একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। দুর্নীতির ফলে বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা এবং সাক্ষীদের প্রভাবিত করার ও ভুক্তভোগীদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটে। মানবাধিকার ও দুর্নীতি নজরদারি সংস্থার বেশ কিছু প্রতিবেদনে বিচার বিভাগের দলীয়করনের ধারণা থেকে জনমনে অসন্তোষ বেড়ে যাবার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

আগস্টে ডেইলি স্টারের এক অনুসন্ধান প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা পেয়েছেন। প্রতিবেদন অনুসারে বেশ কিছু সাংবিধানিক সংশোধনীকে বাতিল ঘোষণা করে কয়েকটি রায় প্রদানের অল্পকিছুকাল পূর্বে হক ও হাইকোর্ট বিভাগের বেশ কয়েকজন বিচারপতিকে এ অর্থ দেয়া হয়। নির্বাচনকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার বিধানও এর অন্তর্ভুক্ত যা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সংসদকে ১৫তম সংশোধনী আনতে সাহায্য করে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এ অর্থ স্থানান্তরের কথা নিশ্চিত করেন এবং হক বলেন যে এই অর্থ তার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ব্যয় করা হবে।

আইন জনগণকে সরকারের তথ্য জানার সুযোগ প্রদান করেছে, তবে বাস্তবে এ আইন পুরোপুরি কার্যকর ছিল না। তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য জানার অধিকারের ওপর একটি সচেতনতা সৃষ্টিমূলক অভিযান পরিচালনা করে। সেপ্টেম্বর মাসে আইনে উলে-খিত সময়ের মধ্যে একজন আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান না করার জন্য কমিশন সরকারি হাসপাতালের একজন ডাক্তারকে ১০০০ টাকা জরিমানা করে।

সেকশন ৫ মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি তদন্তের ব্যাপারে সরকারি মনোভাব

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক মানবাধিকার সংস্থা সাধারণত স্বাধীনভাবে ও সরকারি বিধিনিষেধ ছাড়াই তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত করে তাদের প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করেছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো প্রায়শই সরকারের কঠোর সমালোচনা করলেও তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করেছে। সরকারি কর্মকর্তারা তাদের মতামতের প্রতি সাধারণত সাড়াপ্রদান বা সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করেনি।

সরকার ধর্মীয় সংগঠনসহ সকল এনজিও'র জন্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছিল। অধিকার, ডক্টরস ইউদাউট বর্ডারস, অ্যাকশন অ্যাগেইস্ট হাঙ্গার, হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল এবং বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কারর্স সলিডারিটিসহ দেশী-বিদেশী এনজিওগুলো এমন অনেক নির্ভরযোগ্য উদাহরণ উপস্থাপন করে যেখানে সরকার প্রকল্প বাতিল করে দিয়ে বা কার্যপরিচালনার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে তাদের কাজে বাধাদানের চেষ্টা করেছে। যার ফলে তারা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে তাদের কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।

<u>সরকারের মানবাধিকার সংস্থা:</u> সরকার দেশটির সাত সদস্য বিশিষ্ট মানবাধিকার কমিশনের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছে। তবে বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত সংস্থাটি পুরোপুরি কার্যকর ছিল না। যদিও সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ সংস্থাটির ম্যান্ডেটে ব্যাপক পরিবর্তন আনার অনুরোধ জানিয়ে মার্চে বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

সেকশন ৬ বৈষম্য, সামাজিক নিগ্রহ ও মানব পাচার

আইনে নারীর প্রতি কয়েক ধরনের বৈষম্য করা যাবে না বলে সুনির্দিষ্টভাবে উলে-খ আছে। এছাড়া নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতার জন্য রয়েছে বিশেষ পদ্ধতির বিচার ব্যবস্থা, কঠোরতর শাস্তির বিধান, ক্ষতিগ্রস্ত নারীর

জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনার তদন্তকারী কর্মকর্তার অবহেলা এবং ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতার জন্য আছে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান। তবে এসব আইনের প্রয়োগ ছিল দুর্বল। নারী, শিশু, সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রায়শ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়েছেন।

নারী

ধর্ষণ ও পারিবারিক সহিংসতা: আইনে ধর্ষণ ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শারীরিক নিগ্রহ নিষিদ্ধ। কিন্তু দম্পতির মধ্যে ধর্ষণের ব্যাপারে কোন আইনি বিধান নেই। অধিকার জানায়, এ বছর ৭১১ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে খবর পাওয়া যায়, যার মধ্যে ৪৫০টি ঘটনা ঘটেছে নারী শিশুর বিরুদ্ধে। মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারীরা জানান, ধর্ষণের মোট ঘটনা এই হিসেবের চেয়ে অনেক বেশি হবে। কেননা সামাজিক লোকলজ্জার কারণে অনেক ধর্ষিতা নারীই ঘটনা প্রকাশ করেন না। ধর্ষণকারীদের বিচার সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে হয়নি। ধর্ষণের শিকার ৭১১জন নারীর মধ্যে ১১৯ জনই গণধর্ষণের শিকার হয়। ৫৪ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব অনুসারে, এ বছর পুলিশের কাছে ৮৩টি ধর্ষণ প্রচেষ্টার মামলাসহ ধর্ষণের কেবল ৫৯৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অধিকারের মতে জুনের ২ তারিখে ঢাকার টঙ্গীতে একদল লোক একটি কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণ করে। তাদের নেতৃত্বে ছিল মেয়েটির বাড়িওয়ালার ছেলে মহিউদ্দিন। মেয়েটিকে ধর্ষণ করার পর হত্যাকারীরা তার দেহে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। মেয়েটি বেশ কিছুদিন পরে মারা যায়। এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানিয়েছে আদিবাসী নারীদেরকে ধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা এ বছর উলে-খযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

যেমন, ডেইলি স্টার জানায়, ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী জেলার গোদাগারি উপজেলায় একজন স্থানীয় নারীর গণধর্ষণের ঘটনার পর গ্রাম্য সালিশে জড়িত থাকার কারণে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ একজন ক্যাথলিক ধর্মযাজকসহ নয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। অভিযোগ করা হয় আটজন গ্রামবাসী ১৪ বছর বয়সী এক আদিবাসী মেয়েকে ধর্ষণ করে এবং সালিশের পর মেয়েটি আত্মহত্যা না করা পর্যন্ত তাকে হয়রানি করে। বেআইনি গ্রাম্য সালিশ মেয়েটিকে তার বাড়ির কাছে একটি কনভেন্টে (যেখানে খ্রিস্টান পাদ্রী ও নানরা থাকে) পাঠিয়ে দেয় এবং পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ধর্ষণকারীদের মেয়েটির পরিবারকে কিছু টাকা দিয়ে দিতে আদেশ দেয়। মামলাটি বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত চলছিল।

সংসদে ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে পারিবারিক নির্যাতন (সুরক্ষা ও প্রতিরোধ) বিল পাস হয়। এতে পারিবারিক নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। নারীর অধিকার নিয়ে কাজ করা গোষ্ঠীগুলো এর আগে পরিবারিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সরকারের সমালোচনা করেছিল। পারিবারিক নির্যাতনের মাত্রা ছিল ব্যাপক এবং আলোচ্য বছরে তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে তা পরিমাপের জন্য তথ্য উপাত্ত পাওয়াটা বেশ কঠিন ছিল। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের ২০০০ সালের এক সমীক্ষা অনুসারে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নারী তাদের জীবনে অন্তত একবার পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা

আইনজীবী সমিতি নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা সংক্রান্ত ৩৮৪টি মামলা দায়ের করেছে এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়ে তারা ৪২৪৭টির বেশি রিপোর্ট পেয়েছে। পারিবারিক নির্যাতন বন্ধের অধিকাংশ প্রচেষ্টাই এনজিও-দের অর্থায়নে গ্রহণ করা হয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে খুব সামান্যই সহায়তা পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ, পত্রিকার প্রতিবেদন অনুসারে ডিসেম্বরে রফিকুল ইসলাম তার স্ত্রী হাওয়া আক্তার জুলিকে বেধে মুখে কাপড় দিয়ে তার এক হাতের সবগুলো আঙ্গুল কেটে ফেলে। সে কলেজে যেতে শুরু করার কারণে তাকে এ শাস্তি দেয়া হয়। ইসলামকে আটক করা হয়, বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত মামলাটি চলছিল।

অসংখ্য সংবাদপত্র ও মানবাধিকার প্রতিবেদন অনুসারে, জুন মাসের প্রথমদিকে ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় সৈয়দ হাসান সুমন তার স্ত্রীকে নির্মমভাবে প্রহার করে। সে স্ত্রীর নাকের এক অংশ কামড়ে জখম করে এবং এক চোখ অন্ধ করে ফেলে। সুমন অভিযোগ করে যে, তার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল। তবে আদালত সুমনের যুক্তিকে প্রত্যাখান করে এবং পুলিশ তার বিরুদ্ধে পারিবারিক নির্যাতনের অভিযোগ আনে। বিচারের অপেক্ষায় পুলিশী হেফাজতে থাকার সময় অজ্ঞাত কারণে সে মারা যায়।

নারী নির্যাতনের কিছু ঘটনা ঘটে যৌতুক নিয়ে বিরোধের কারণে। যেমন, ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন অনুসারে ১০ সেপ্টেম্বর যৌতুক নিয়ে বিবাদের সময় রংপুর জেলার ঠাকুরগাঁও উপজেলায় আয়নাত আলী ও তার বেশ কয়েকজন আত্মীয় নিয়ে তার স্ত্রীকে নির্মমভাবে প্রহার করে ও বিষ খাওয়ায়। মেয়েটির পরিবারের কাছ থেকে বড় অংকের যৌতুক আদায় করার জন্য গত দু'বছর ধরে তারা মেয়েটিকে মারধর করত বলে অভিযোগ করা হয়। মেয়েটির মৃত্যুর পর অত্যাচারকারীরা ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে চায়। মেয়েটির পরিবার স্থানীয় পুলিশের কাছে একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত মামলাটি চলছিল।

আলোচ্য বছরে যৌতুকের কারণে হত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন ও সালিস কেন্দ্র শারীরিক নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ এবং হত্যাসহ যৌতুকের কারণে নির্যাতনের ৫০২টি ঘটনার কথা উলে-খ করে, গতবছর এ সংখ্যা ছিল ৩৯৫টি। পারিবারিক নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের সহযোগিতা করার জন্য পর্যাপ্ত কোনো সহায়তাকারী গোষ্ঠীও নেই। এ বছর যৌতুকের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন ও সালিস কেন্দ্র শারীরিক নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ এবং হত্যাসহ যৌতুক নিয়ে ৫০২টি নির্যাতনের ঘটনার কথা জানিয়েছে। অন্যদিকে গত বছর এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা ছিল ৩৯৫টি। পরিবারিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য পর্যাপ্ত সহায়তা গোষ্ঠী নেই।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির মত কয়েকটি এনজিও হতদরিদ্র ব্যক্তি, দুস্থ নারী ও শিশুদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করেছে। আদালত এই ধরনের নারী-শিশুর বেশিরভাগকেই আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়েছেন। সামান্য যে কয়জনকেও বা কারাগারে পাঠানো হয়েছে তাদের পাঠনো হয়েছে অন্যত্র সরানোর আগে স্বল্প সময় অস্থায়ীভাবে রাখার জন্য।

মে মাসের ১২ তারিখে ফতুয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ২০০১ সালে হাইকোর্ট যে রায় প্রদান করে সুপ্রিম কোর্টেও আপিল বিভাগ তাকে বাতিল ঘোষণা করে; তবে কোর্ট তার রুলিংয়ে ঘোষণা করে যে, কেবল ধর্মীয় বিষয় মীমাংসার জন্য ফতোয়াকে ব্যবহার করা যাবে এবং এর দ্বারা শাস্তিপ্রদানের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, একে বিদ্যমান ধর্মনিরপেক্ষ আইনের ওপর স্থান দেয়া যাবে না। ইসলামি রীতি অনুযায়ী কেবল মুফতি বা ইসলামি

আইনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাই ফতোয়া দেয়ার কর্তৃত্ব রাখেন। তবে দেখা গেছে যে, গ্রাম্য মৌলভিরা কখনও কখনও কোন বিষয়ে তাদের অভিমত দিয়ে সেগুলিকে ফতোয়া বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এই ধরনের ফতোয়ার ঘটনা বেশিরভাগই ঘটেছে নারীর বিরুদ্ধে নৈতিক স্খলনের অভিযোগে এবং এ ধরনের ফতোয়ার কারণে বিচারবহির্ভূত সাজা হতে পারে।

নারীদের বিরুদ্ধে আইন হাতে তুলে নেয়ার ঘটনা ঘটেছে। মৌলভিরা কখনও কখনও নারীর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে এমন ঘটনার সৃষ্টি করেছেন। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মতে, আলোচ্য বছরে নারীর বিরুদ্ধে ৫৯টি আইন হাতে তুলে নেবার ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে মাত্র ২০টি ঘটনার ক্ষেত্রে পুলিশ ব্যবস্থা নেয়। শাস্তির মধ্যে ছিল দোররা মারা, মারধর করা এবং অন্যান্য ধরনের শারীরিক নিপীড়ন।

উদাহরণস্বরূপ বেশ কিছু পত্রপত্রিকা ও মানবাধিকার গোষ্ঠীর প্রতিবেদন অনুসারে ঢাকা বিভাগের শরীয়তপুর জেলায় ফতুয়া ভিত্তিক গ্রাম্য সালিসে ৫০ বার বেত্রাঘাতের পর ১৫ বছর বয়সী একটি মেয়ে মারা যায়। এক আত্মীয়ের দ্বারা ধর্ষিত হবার পর তাকে ব্যভিচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। স্থানীয় ডাক্তারের প্রাথমিক ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে মেয়েটির স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে বলা হয়। তবে সারা দেশে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হলে হাই কোর্ট মেয়েটির মৃতদেহ কবর থেকে তুলে পুনরায় ময়নাতদন্ত করে মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ধারণের নির্দেশ দেয়। হাইকোর্ট গ্রামের সালিসকারীদের গ্রেফতারের এবং স্থানীয় ডাক্তারের মেডিকেল লাইসেন্স বাতিলেরও আদেশ দেয়। বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত মামলাটি চলছিল।

এসিড হামলার ঘটনা একটি মারাত্মক সমস্যা ছিল। হামলাকারীরা ভুক্তভোগীদের - যারা বেশিরভাগই নারী- মুখে এসিড নিক্ষেপ করেছে এবং এসব আক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চেহারা বিকৃত হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা অন্ধ হয়ে গেছে। স্বামী বা স্ত্রীর একে অন্যের প্রতি অবিশ্বস্ত থাকার অভিযোগেও অনেক সময় এসব আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। অধিকারের হিসাব মতে, এ বছর সারা দেশে ১০১ ব্যক্তি এসিড হামলার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ৫৭ জন নারী, ২৫ জন পুরুষ এবং ১৯ জন শিশু। সরকার অপরাধীদের শাস্তিপ্রদান ও সাধারণ মানুষ যাতে সহজে এসিড না পায় সে ব্যাপারে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে।

উদাহরণস্বরূপ, অধিকার জানায়, খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা জেলায় লিটন সরদার তার স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহের দায়ে তার বিরুদ্ধে মামলা করায় স্ত্রীর মুখে এসিড নিক্ষেপ করে। এসিড হামলার শিকার ব্যক্তিটিকে গুরুতর আঘাতসহ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত মামলাটি চলছিল।

সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখে সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার এক আদালত ২০০৬ সালের এসিড সহিংসতার ঘটনায় চার ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করে। আব্দুল কাইয়ুম, হারিস মিয়া, অলি মিয়া ও আলকাস উদ্দিনকে এই ঘটনার জন্য ৫০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। এ ঘটনায় ১৮ বছর বয়সী এক মেয়ের ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঢুকে তারা তার দিকে অগ্রসর হয় এবং মেয়েটি তাদেরকে প্রত্যাখান করলে তার মুখে এসিড ছুড়ে মারে। কেবল হারিস মিয়াকে আদালতে বিচার করা হয়, যেহেতু অন্য তিন আসামী পলাতক ও ফেরারি অবস্থায় ছিল।

এসিড নিক্ষেপের মামলাগুলো বিশেষ আদালতে দ্রুততর বিচারের বিধান রয়েছে এবং এই আইন সাধারণত জামিন অনুমোদন করে না। নারী ও শিশু নির্যাতন নিয়ন্ত্রণ আইনের উদ্দেশ্য ছিল এসিডের প্রাপ্তি নিয়ন্ত্রণ করে নারীদের

ওপর এসিড সন্ত্রাস কমানো। আইনটি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং দুর্বল প্রয়োগের কারণে এই আইনের সফলতা সীমিত ছিল। এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের মতে বিশেষ ট্রাইবুনালগুলো পুরোপুরি কার্যকর নয়। প্রতিবছর যে পরিমাণ এসিড আক্রমণ হয় তার ১০ থেকে ১২ শতাংশ ঘটনার ক্ষেত্রে প্রসিকিউটররা দোষী সাব্যস্ত করাতে পেরেছেন। জানুয়ারি মাসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কেবল সংশি-ষ্ট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নিবন্ধিত বিক্রেতাদের কাছে এসিড বিক্রয়কে সীমিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তবে সার্বজনীনভাবে এ বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হয়নি এবং সারা বছর ধরে এসিড আক্রমণ অব্যাহত ছিল।

যৌন হয়রানি: এ বছর স্কুলে, কর্মক্ষেত্রে ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে যৌন হয়রানি একটি সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান ছিল। 'জার্নাল অব ইন্টারপারসনাল ভায়লেন্স'র ২০০৯ সালের এক প্রতিবেদনে দেখে গেছে যে ২০০৪ সালে যে ৫১০৬ জন অবিবাহিত গ্রাম্য কিশোরীর ওপর সমীক্ষা চালানো হয় তাদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ হয়রানি, ৩৪ শতাংশ অনাকাঙ্ক্ষিত লালসার দৃষ্টি ও ১৪ শতাংশ যৌন কারণে ভয়ভীতি প্রদর্শনের শিকার হয়েছে।

প্রজনন অধিকার: প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজলভ্য ছিল, কিন্তু আয় ও শিক্ষা এসব তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রূপে কাজ করেছে। ওষুধ কোম্পানিগুলো পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন ধরনের বিকল্প পদ্ধতি বের করে তবে সনাতন পারিবারিক ভূমিকা এগুলো গ্রহণের উন্মুক্ত সুযোগে অনেক সময় বাধা প্রদান করে।

বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্য সেবা সমীক্ষা ২০১০-এ দেখা গেছে যে, বিগত নয় বছরে প্রতি ১০০০০০ জন জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর মায়েদের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, অর্থাৎ ৩২২ থেকে ১৯৪-এ নেমে এসেছে। প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ক্ষেত্রে শিশু জন্মের পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ এবং অ্যাকলাম্পশিয়ার কারণে মাতৃমৃত্যু ঘটে। ৭ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রসবকালীন সমস্যার কারণে মাতৃতৃত্যু ঘটে। তিনজন মায়ের মধ্যে একজন মা মারা যান অন্যান্য কারণে। কেবল ২৭ শতাংশ শিশুর জন্ম দক্ষ ধাত্রীর হাতে হয়ে থাকে (২৩ শতাংশ প্রসব হয় স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে এবং ৪ শতাংশ হয় বাড়িতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর হাতে)। যদিও প্রতি চারজন শিশুর মধ্যে তিনজনই বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে, তারপরও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে সন্তান প্রসবকারী নারীর সংখ্যা ৯ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ৫৬ শতাংশ নারী অন্তত একবার ডাক্তারের কাছে চেক-আপ করাতে এসেছে। কেবল ২৪ শতাংশ নারী চারটি চেকআপের সবগুলো করেছে। প্রতি চারজন নারীর মধ্যে একজনেরও কম নারী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে প্রবসের দু'দিনের মধ্যে প্রবসপরবর্তী সেবা লাভ করেছে।

বৈষম্য: সমাজে নারীরা অধঃস্তন অবস্থানে ছিলেন এবং তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সরকার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। মার্চের ৭ তারিখে মন্ত্রীসভা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি অনুমোদন করে। এতে নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়। নতুন নীতি, যা আইনের ন্যায় শক্তিশালী নয়, সম্পত্তি, ব্যবসা ও উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অংশ থাকার কথা বলে। প্রথাগত মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অর্ধেক সম্পত্তির মালিকানা পায়। পরিবারে কোন পুত্র সন্তান না থাকলে পরিবারের সকল দায়দেনা নিষ্পত্তির পর যা অবশিষ্ট থাকে শুধু সেটুকু তারা পায়। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করবে এবং তার মৃত্যুর পর পুরুষ উত্তরাধিকাররা তা ভোগ করবে। উত্তরাধিকার সূত্রে সমান সম্পত্তি লাভের বিষয়টি প্রতিবাদের জন্ম দেয় এবং সারা দেশে রক্ষণশীল ইসলামি দলগুলো হরতাল আহবান করে। সরকারের বেশকয়েকজন নেতা বলেন যে এই নীতিকে

বিদ্যমান ধর্ম-ভিত্তিক উত্তরাধিকার আইনের ওপর স্থান দেয়া হবে না এবং বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত আইনে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি।

গত দশকে পুরুষদের চেয়ে নারীর চাকুরির সুযোগ অধিকতর হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মূলে রয়েছে দেশের রফতানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প। পোশাক কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই নারী। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে নারী ও পুরুষের মজুরির হারে কিছুটা তারতম্য থাকলেও গার্মেন্টস খাতে তা তুলনামূলকভাবে এক ছিল।

শিশু

সরকার স্থানীয় ও বিদেশী এনজিওদের সহায়তায় শিশুদের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে কাজ করেছেন এবং এসব যৌথ প্রয়াসের ফলে শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা খাতে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তবে কিছুটা অগ্রগতি সত্ত্বেও সরকার, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (ডবি-উএফপি) ও জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) পরিচালিত "পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি মূল্যায়ন ২০০৯" শীর্ষক যৌথ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ৪৮.৬ শতাংশ শিশু এখনো মারাত্মক অপুষ্টির শিকার। **

<u>জন্ম নিবন্ধন:</u> দেশের ভূখণ্ডে জন্ম নেয়া কাউকে আপনা-আপনি নাগরিকত্ব প্রদান করার বিধান আইনে নেই। যদি কোনো ব্যক্তি নিজে, তার বাবা-মা বা দাদা-দাদীরা বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত এমন কোন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করে, তাহলে সে দেশের নাগরিক বলে গণ্য হন। পিতৃ-পুরুষের উত্তরাধিকারের পরিচয়ে যারা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য তাদের বাবা বা দাদাকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বা তারপর এ ভূখণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।। জন্মনিবন্ধন কেবল জনসংখ্যার ১০ ভাগের কাছে পৌঁছেছে।

<u>শিক্ষা:</u> প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক, তবে এর বাস্তবায়নে কিছুটা ঘাটতি রয়ে গেছে। এর অন্যতম কারণ পিতামাতারাই ছেলেমেয়েকে আয়রোজগারের জন্য বা গৃহস্থালি কাজে সাহায্যের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে রেখেছেন। শিশুদের স্কুলে পাঠানোর জন্য পরিবারের প্রতি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলোয় ভর্তির হার সাম্প্রতিক বছরগুলোয় উলে-খযোগ্য বৃদ্ধি করেছে। এসব প্রয়াস সত্ত্বেও সরকারি স্কুলগুলো নানা ধরনের ফি আদায় করেছে যা গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং এসব পরিবারের ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে নিরুৎসাহিত করে।

<u>শিশু নিপীড়ন:</u> শিশু পরিত্যাগ, নিপীড়ন, অপহরণ এবং পাচারের ঘটনা একটি মারাত্মক ও ব্যাপক সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠাসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও শিশুপাচারের ঘটনা সমস্যা হিসেবেই থেকে গেছে। কিছু কিছু শিল্পে, বেশির ভাগই অনানুষ্ঠানিক খাতে, শিশুশ্রম একটি সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। এর ফলে তাদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, বিশেষ করে বাসাবাড়িতে কর্মরত শিশুশ্রমিকদের সাথে মালিকরা দুর্ব্যবহার করেছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ

পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত কর্মীদের মৃত্যু ও জখম এবং তাদের ওপর যৌন আক্রমণের যতগুলো ঘটনা ঘটেছে তার ৫০ ভাগও বেশি ঘটেছে শিশু গৃহপরিচারিকাদের ওপর।

বাল্য বিবাহ: বিয়ের আইনগত বয়স মেয়েদের জন্য ১৮ এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছর হলেও অল্প বয়সে বিয়ে হওয়া ব্যাপক সমস্যা হিসেবে রয়েই গেছে। কম বয়সে ঠিক কতসংখ্যক বিয়ে হয় সে সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া সহজসাধ্য নয়। কারণ বিয়ের নিবন্ধন হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে এবং জন্ম নিবন্ধন হয়েছে কদাচিৎ। বিশ্বের শিশুদের ওপর জাতিসংঘের ২০১১ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এ দেশে বাল্যবিবাহের হার ৬৬ শতাংশ। এর মধ্যে ৫৩ শতাংশ শহুরে এলাকায় এবং ৭০ শতাংশ গ্রামে। বাল্যবিবাহ রোধের উদ্দেশ্যে যেসব বাবা-মা তাদের মেয়ের লেখাপড়া অন্তত ১৮ বছর পর্যন্ত চালিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার করেন সরকার সেসব ছাত্রীর লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহনের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করে।

শিশুদের যৌন নিপীড়ন: অপরাধের কারণের ওপর নির্ভর করে শিশু নির্যাতনের জন্য ১০ থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত শাস্তির বিধান রয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন আইন (২০০৩) অনুসারে উভয়ের সম্মতিতে যৌনকর্ম করার ন্যূনতম বয়স ১৬ বছর। তবে দন্ডবিধিতে তা ১৪ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বৈষম্য আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। অশ-ীল পণ্য বিক্রয় ও বিতরণের বিরুদ্ধে দন্ডবিধিতে যে সংবিধি আছে তার ভিত্তিতে শিশু পর্ণগ্রাফি নিষিদ্ধ। এর জন্য শাস্তি হল তিনমাসের জেল ও জরিমানা। তবে ডিসেম্বর মাসে সরকার প্রকাশ্যে এর পর্ণগ্রাফি বা অশ-ীল চলচ্চিত্র সম্পর্কিত সংবিধির মধ্যকার অসাম্যঞ্জস্যকে স্বীকার করে এবং পর্ণগ্রাফি বিরোধী একটি নতুন বিল আনে যাতে শিশু পর্ণচিত্র রাখা ও বিতরনের জন্য ১০ বছরের কারাদন্ড ও জরিমানার কথা বলা হয়েছে। ২০০৯ সালে শিশুদের বাণিজ্যিক যৌন নিপীড়ন বা পতিতাবৃত্তির ওপর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে একটি বেইজলাইন জরিপ সম্পন্ন করে। এ জরিপ অনুসারে যৌন নিপীড়নের শিকার ১৮,৯০২ জন শিশুর মধ্যে ৮৩ শতাংশ হল মেয়ে, ৯ শতাংশ হিজড়া ও ৮ শতাংশ হল ছেলে শিশু। চলি-শ শতাংশ মেয়ে এবং ৫৩ শতাংশ ছেলের বয়স ১৬ বছরের নিচে।

আন্তর্জাতিক শিশু অপহরণ: বাংলাদেশ ১৯৮০ সালের আন্তর্জাতিক শিশু অপহরণের নাগরিক দিক বিষয়ক হেগ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। এ বিষয়ে তথ্যের জন্য http://travel.state.gov/abduction/resources/congressreport/congressreport_4308.html- লিঙ্কে গিয়ে চুক্তি মেনে চলা বিষয়ক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন দেখুন।

ইহুদি বিদ্বেষ

বাংলাদেশে কোন ইহুদি সম্প্রদায় নেই এবং স্থানীয় জনগণের ইহুদি বিদ্বেষী কার্যক্রমেরও কোন খবর পাওয়া যায়নি। তবে কিছু কিছু সংবাদপত্র মাঝে-মধ্যে ইহুদি বিদ্বেষী নিবন্ধ ও মন্তব্য প্রতিবেদন ছাপিয়েছে।

মানব পাচার

মানব পাচার বিষয়ক তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক মানব পাচার প্রতিবেদনটি দেখুন, যা এই ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে: www.state.gov/j/tip

প্রতিবন্ধী

আইনে প্রতিবন্ধীদের সমান আচরণ পাওয়ার এবং বৈষম্য না করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। আইনে প্রতিবন্ধিতা রোধ, চিকিৎসা, শিক্ষা, পুনর্বাসন, চাকুরি, যানবাহন ব্যবহারের সুযোগ ও অ্যাডভোকেসির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

২০০১ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন এবং এর ২০০৮ প্রবিধান দেশটির সমন্বিত প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত আইনকে উপস্থাপন করে। তবে, বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে অস্পষ্টতা, দুর্বল বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং প্রভাবশালী অব্যাহতির ধারার কারণে এ আইনের প্রভাব সীমিত। এ আইনের অধিকাংশ ধারাই ইতিবাচক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে যা বাস্তবায়ন বা প্রয়োগ করা কঠিন। যেমন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ১৮ বছর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সরকার ওপর যে দায়িত্ব দেয়া হয় তা কোন বাস্তব রূপ পায়নি। এই আইনে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, যা আইনের বাস্তবায়নকে সীমিত করেছে।

এই আইন "মানসিক প্রতিবন্ধী" শিশুদেরকে বাধ্যতামূলক সরকারি শিক্ষা থেকে বাদ দিয়েছে। এই আইন অভিভাবক ও পরিচর্যাকারীদের অজ্ঞতার কারণে করা ছোটখাটো ভুল বা বাধ্য হয়ে সন্তানকে অন্যত্র পাঠানোর ব্যাপারে যথাযথ রক্ষাকবচ প্রদান করে না। যেমন, ৪০ জন মনোসামাজিক প্রতিবন্ধী সাধারণ কারাগার ব্যবস্থায় রয়ে গেছে, যেখানে তাদের কেউ কেউ প্রায় দু'দশক ধরে আছে।

আইন প্রতিবন্ধীদের সরকারি ও বিচারবিভাগীয় পদে আবেদন করার ক্ষেত্রে বাধাদান করে। ২০১০ সালের এপ্রিলে শুরু হওয়া জনস্বার্থ বিষয়ক মামলায় এ দুই প্রবিধানকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়। তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়মিতই এসব পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে এবং তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আইনে নতুন ভবন তৈরির সময় প্রবেশযোগ্যতার শর্তাবলি অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছে। তবে, বাস্তবে এসব শর্তাবলি ঠিকভাবে না দেখেই নতুন ভবন নিমার্ণের পরিকল্পনার অনুমোদন দেয়া হচ্ছে।

যারা প্রতিবন্ধী নয় তাদের মত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও আইনগতভাবে তথ্য লাভের সমান অধিকার রয়েছে। তবে তারা এ অধিকার পাবে কি পাবে না তা অনেকসময়ই নির্ভর করে তাদের পরিবারের ওপর।

আইনে সরকারের পৃষ্ঠপোশকতায় আইনগত সেবা পাবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত দল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে জাতীয় ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধীদের অধিকার রক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। মানসিক প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসাদানের সরকারি সুযোগ অপর্যাপ্ত। প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের জন্য আলোচ্য বছরে বেশ কিছু বেসরকারি উদ্যোগ বিদ্যমান ছিল। হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনালসহ বেশকিছু এনজিও প্রতিবন্ধীদের সাহায্য করা এবং তাদের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী

সরকারি চাকুরি ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আদিবাসীদের অংশগ্রহণের জন্য সরকারি কোটা থাকলেও আদিবাসী সম্প্রদায় ব্যাপক বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। সরকার সামাজিক সহিংসতা থেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতেও ব্যর্থ হয়েছে।

অধিকারের মতে, এ বছর আদিবাসী ও বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে ৪০জন নিহত, ৯৪ জন আহত, ১৭ জন অপহৃত, ১৮ জন ধর্ষিত এবং নৃত্তাত্বিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ৪০টি ঘর ধ্বংস হয়।

যেমন, ১৭ এপ্রিল, এনজিও এবং সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় উপজেলায় বাঙালি বসতি স্থাপনকারী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কয়েকটি সহিংস সংঘাতের ঘটনায় অন্তত চার ব্যক্তি নিহত এবং অসংখ্য ব্যক্তি আহত হয়। জমি নিয়ে বিরোধের কারণে এ সংঘর্ষ শুরু হয় এবং এর ফলে অন্তত চারটি আদিবাসী গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়। খাদ্য মজুত ঘর ও বৌদ্ধমন্দিরকে লক্ষ্য করে এ অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটানো হয়। স্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এক বিবৃতিতে দাবি করে যে এ অগ্নিসংযোগের ঘটনার সাথে জড়িত বাঙালি বসতি স্থাপনকারীরা নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় এ ঘটনা ঘটায়। সরকার এ দাবি প্রত্যাখান করে। অন্তত একজন আদিবাসী পুরুষকে পুলিশী হেফাজতে নেয়া হয় এবং আক্রমণের পর থেকে সে নিখোঁজ অবস্থায় রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঘাই হাটে ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে বাঙালি বসতিস্থাপনকারী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যকার সংঘাতের ঘটনার ক্ষেত্রে নতুন কোন অগ্রগতি হয়নি। এসব সংঘাতের সময় উভয়পক্ষ বেশ কিছু ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ঘরের বাসিন্দারের ওপর লাঠিসোটা ও বন্দুক দিয়ে হামলা চালায়। এসব ঘটনায় দুজন আদিবাসী মারা যায়।

এ দেশের "আদিবাসী জনগোষ্ঠী আদিবাসী" নয়, সুতরাং তারা "ক্ষুদ্র নৃত্তাত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী" বলে পরিচিত হবে এ ঘোষণা দিয়ে এ বছর সরকার বেশ কিছু বিবৃতি প্রকাশ করে। সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী এই নতুন শ্রেণিবিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে। আদিবাসী নেতারা পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের ও বাংলার সমতল ভূমির দীর্ঘদিনের ইতিহাসের কথা উলে-খ করে এই নতুন নামকরণের বিরোধিতা করে। আদিবাসী নেতারা ক্ষুদ্র নৃত্তাত্বিক সংখ্যালঘু শব্দটিরও বিরোধিতা করে, কারণ এর বাংলা অনুবাদ উপজাতি, যা তাদের কাছে আপত্তিকর একটি শব্দ।

১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তিতে ছয়টি স্থায়ী সেনানিবাস ছাড়া সকল অস্থায়ী শিবির সরিয়ে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। স্বাক্ষরিত হবার পর থেকে সরকার এ পর্যন্ত ২১২ টি শিবির গুটিয়ে নেয়। আরো প্রায় ২৩৫টি শিবির এখনও এই এলাকায় আছে। আলোচ্য বছরও আদিবাসী নেতারা সেনাবাহিনীর উপস্থিতির প্রতিবাদ জানায় এবং সেনাবাহিনী সরিয়ে নেবার আহবান জানায়।

আদিবাসীরা নিজেদের ভূমি ব্যবহারের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে খুব কম প্রভাব ফেলতে পেরেছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন পুনর্গঠন করেছে এবং কমিশন ঘোষণা করেছে যে, ২০০৯ সালে ভূমি জরিপের কাজ শুরু হবে। তবে আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা গোষ্ঠীগুলো এ সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে। কেননা তারা মনে করে এ সুযোগে বাঙালি বসতিস্থাপনকারীরা ঐতিহ্যগতভাবে আদিবাসীদের ভূমির মালিকানা দাবি করে নকল দলিলপত্র তৈরি করতে পারবে। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর জটিল আকারের বিরোধ নিস্পত্তিতে কার্যকরভাবে

দায়িত্ব পালন করতে পারেনি ভূমি কমিশন। বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার সময় এলাকা ছেড়ে যাওয়া পাহাড়িদের পুনর্বাসনে সরকারি সহায়তার অভাবে আদিবাসী নেতারা হতাশ।

অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী লোকজনও বাঙালি মুসলমানদের হাতে তাদের সম্পত্তি হারানোর কথা বলেছে। মৌলভিবাজার ও মধুপুর বনাঞ্চলে আদিবাসীদের ঐতিহ্যগতভাবে বসবাস করা ভূমিতে জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠার প্রকল্প সরকার বাতিলও করেনি বা সেখানে নতুন করে কোন কর্মকাণ্ডও চালায়নি। এছাড়া আদিবাসী সম্প্রদায়, স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা এবং গীর্জাগুলো দাবি করেছে যে, বনবিভাগের কর্মকর্তারা আদিবাসীদের বিরুদ্ধে যে হাজার হাজার মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে সেগুলো এখনও প্রত্যাহার করেনি।

২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটিও পুনর্গঠন করা হয়, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ভূমি কমিশনের সকল কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করে। তারা সেগুলো আরো পর্যালোচনা করে দেখার কথা বলে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষার মত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেয়। তবে সরকার শান্তি চুক্তির ধারা মোতাবেক ভূমির ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির কর্তৃত্ব ছাড়েনি। শান্তি-শৃঙ্খলা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়ে গেছে এবং সেই সাথে আছে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার অসন্তোষ।

সরকার তিন পার্বত্য জেলায় সীমিত আকারে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনার অনুমতি দেয়। নিরাপত্তার কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে সরকার ব্যাখ্যা দিলেও মানবাধিকার সংস্থাগুলো ও স্থানীয় নেতারা দাবি করেন যে, পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে সরকার এমনটা করেছে।

আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো জানিয়েছে এ বছর সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারি বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্যক্তির যৌনমুখিতা ও লিঙ্গভেদে নানা সামাজিক নিগ্রহ, বৈষম্য ও সহিংসতার ঘটনা

সমকামিতা ছিল অবৈধ, তবে বাস্তবে এই আইনের প্রয়োগ কমই হয়েছে। পুরুষ সমকামীদের সহায়তার জন্য কয়েকটি অপ্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক আছে, তবে নারী সমকামীদের সহায়তাদানের কোন সংগঠন বিরল। অপ্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনগুলো জানায়, পুলিশের অভিযানের ভয়ে তারা সংগঠিত হতে, গণসংযোগ কাজ চালাতে, আইন পরিবর্তনের জন্য পিটিশন করতে বা স্থায়ী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। পুরুষ সমকামীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন একটি সংস্থা জানায়, পুরুষ ও নারী সমকামীরা বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গীকে বিয়ে করার জন্য প্রায়শই প্রবল পারিবারিক চাপের সম্মুখীন হয়।

মাঝেমধ্যে নারী ও পুরুষ সমকামী, উভগামী এবং হিজড়াদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে, তবে এসব ঘটনার খোঁজ-খবর রাখা কঠিন, কেননা ঘটনার শিকার ব্যক্তিরা পরিচয় প্রকাশ করতে চান না। যৌনমুখিতা নিয়ে রয়েছে প্রবল সামাজিক লজ্জা এবং বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা হতে দেয়া হয় না। বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি হিজরাদের বিরুদ্ধে ১০৯টি আক্রমণের কথা জানায়। অন্যদিকে ২০১০ সালে এ সংখ্যা ছিল ১২৮।

যদিও হিজড়াদের ওপর প্রকাশ্যে বৈষম্যের ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। কারণ খুব কম লোকই তাদের যৌনমুখিতা খোলাখুলি প্রকাশ করে। তবে তাদের ওপর উলে-খযোগ্য সামাজিক বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। সমকামী পুরুষদের, বিশেষ করে যারা দরিদ্র ঘরের, তাদের পরিবার ও স্থানীয় সমাজ একঘরে করে রাখে। এদের কেউ কেউ হিজড়াদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

২৪ মে তারিখে, নিউ এইজ পত্রিকা প্রকাশ করে যে, যারা নারী বা পুরুষ কোনটি হিসেবেই চিহ্নিত হতে চায় না, পাসপোর্ট অফিস তাদেরকে তাদের পাসপোর্টে "অন্যান্য" শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবার অনুমতি দেবে।

অন্যান্য সামাজিক নিগ্রহ ও বৈষম্যমূলক আচরণ

আলোচ্য বছরে গণপিটুনিতে মৃত্যুও ঘটনা ঘটেছে এবং সংবাদ থেকে জানা যায় যে ২০১০ সালের তুলনায় এ সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকার অন্তত ১৬১ টি হত্যাকান্ডের কথা জানিয়েছে, তবে স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা স্বীকার করে যে প্রকাশিত ঘটনার তুলনায় প্রকৃত ঘটনার সংখ্যা হয়ত অনেক বেশি।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুসারে, ১৮ই জুলাই ঢাকা বিভাগের সাভার জেলার আমিন বাজার এলাকায় একদল মানুষ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উপস্থিতিতে ছয় ব্যক্তিকে ডাকাত সন্দেহে পিটিয়ে মেরে ফেলে। ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত শেষে ছয় জন পুলিশ অফিসারের চাকুরি যায়, তবে বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

বাংলানিউজটোয়েন্টিফোরের এক প্রতিবেদন অনুসারে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র লীগ সোহরওয়ার্দি উদ্যানে একটি গণআদালত বসিয়ে বেশ কিছু হতদরিদ্র্য মানুষকে বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে লাঠি পেটা করে। ঢাকা মহানগর পুলিশ জানায় যে তারা বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে, তবে বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

এইচআইভি/এইডস রোগীদের ওপর সহিংসতা বা বৈষম্যের খবর জানা যায়নি। আক্রান্ত ব্যক্তির পরিচয় গোপন করার মানসিকতা এবং দেশে এই ধরনের রোগীর সংখ্যা খুব কম থাকায় এ সংক্রান্ত গবেষণার অভাবকে দায়ী করেছে এনজিওগুলি।

সেকশন ৭ শ্রমিকের অধিকার

ক. সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার

আইনে শ্রমিকদের কোন সঙ্ঘ বা সমিতিতে যোগ দেওয়ার এবং সরকারের অনুমতি নিয়ে সঙ্ঘ বা ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার আছে, যদিও শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের বিধিনিষেধ ছিল। যেমন, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমশক্তির ৩০ শতাংশের বেশি সদস্য না হলে শ্রমিক ইউনিয়নের নিবন্ধনের অনুমতি দেওয়া হবে

না; ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ৩০ শতাংশের কম হলে ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেয়া যাবে; এক প্রতিষ্ঠানে তিনটির বেশি ইউনিয়ন গঠন করা যাবে না; এবং ম্যানেজার শ্রেণীর কর্মী , অগ্নি নির্বাপক কর্মী, নিরাপত্তা কর্মী এবং নিয়োগকর্তা কর্তৃক "গোপনীয়" শাখার কর্মী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মীরা ইউনিয়নে যোগদান করতে পারবে না।

সরকারি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীদের ইউনিয়ন গঠন আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ২০০৬ সালে শিক্ষক ও এনজিও কর্মীসহ নতুন কয়েক শ্রেণীর শ্রমিককে ইউনিয়ন গঠনের অনুমতি দেয়া হয়; তবে ২০০৭-০৯ সালের জরুরি অবস্থার সময় ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর ব্যাপক বিধিনিষেধ থাকায় এসব বিধান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণয়ন করা হয়নি।

২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইনে ২৫ টি পৃথক শ্রম আইনকে এক করে একটি ব্যাপক-ভিত্তিক আইন করা হয়েছে। শ্রম বিষয়ক পরিচালক ইউনিয়নের নিবন্ধন দেয়ার ও প্রয়োজনে তা বাতিল করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রার শ্রম আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল করতে পারেন। আলোচ্য বছরে প্রধানত শ্রমআইন লঙ্ঘনের দায়ে কয়েকটি ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। নিবন্ধন বাতিল বা নিবন্ধন না দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার ইউনিয়নগুলোর রয়েছে।

আইনে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকারের কথা স্বীকার করা হয়েছে। তবে এই অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। যেমন, ইউনিয়নের ৭৫ ভাগ সদস্য রাজি হলেই কেবল ধর্মঘটে যাওয়া যায়। কোন ধর্মঘট ৩০ দিনের বেশি চললে সরকার সে ধর্মঘট বন্ধ করে দিয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে পাঠাতে পারে। উপরন্তু,বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার প্রথম তিন বছর, বা কারখানাটি যদি বিদেশী বিনিয়াগে তৈরি করা হয়ে থাকে, অথবা বিদেশী কোন বিনিয়োগকারী যদি এর মালিক হন তাহলে সেখানে কোন ধর্মঘট করা নিষিদ্ধ। আইন শ্রমিকদের কোনরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়া সংগঠিত হবার ও যৌথভাবে দরকষাকষি করার অধিকার প্রদান করেছে, তবে এ অধিকার সবসময় কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। বাংলাদেশ শ্রমিক সংঘ সাংগঠনিক কার্যক্রমে মালিকদের হস্তক্ষেপ থেকে ইউনিয়নগুলোকে রক্ষা করার বিধান রেখেছে। মালিকরা অনেকসময় এ অধিকার হ্রাস করার চেষ্টা করে, বিশেষত তৈরি পোশাক শিল্পে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী বৈধভাবে নিবন্ধিত শ্রমিক ইউনিয়নগুলো মালিক পক্ষের সাথে যৌথ দরকষাকষি করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এটা ঘটেছে কদাচিৎ। এই আইন যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণের পন্থাটি সহজ করেছে এবং এই প্রক্রিয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। শ্রমিক সংগঠনগুলো জানায়, কোন কোন কোম্পানিতে পাল্টা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেয়ার ভয়ে শ্রমিকরা তাদের এই অধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থেকেছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইনে আপোষরফা, সালিশি এবং শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান রাখা হয়েছে। কোন বিরোধে সমাধানে পৌঁছা না গেলে শ্রমিকরা ধর্মঘটে যাওয়ার অধিকার রাখে। সরকারি কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা বাহিনীর আপোষরফা, সালিশি এবং শ্রম আদালতের সমাধানের জন্য কোন প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি নেই। তবে তারা সরকারি কর্মকর্তাদের প্রবিধান অনুসারে নির্দিষ্ট আদালতে যেমন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করতে

পারে। বাস্তবক্ষেত্রে খুব কম ধর্মঘটই আইনগত শর্তাবলি মেনে হয়; শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই অধিকাংশ ধর্মঘট বা কর্মবিরতি পালিত হয়।

২০১০ সালে জাতীয় সংসদ "ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন" নামে একটি আইন পাস করে। এতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইপিজেডে ইউনিয়ন করার অধিকারের কথা নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। "ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন"-এর অধীনে পূর্ববর্তী আইনের আওতায় চার বছর আগে গঠিত "শ্রমিক প্রতিনিধি ও কল্যাণ কমিটি" মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। "শ্রমিক প্রতিনিধি ও কল্যাণ কমিটি"-এর স্থলে শ্রমিকরা এখন "শ্রমিক কল্যাণ সমিতি" গঠন করবে। যদিও "ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন"-এ নতুন "শ্রমিক কল্যাণ সমিতি"র নেতা নির্বাচনের জন্য কোন তারিখ নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইনের অধীনে শ্রমিক কল্যাণ কমিটির মত শ্রমিক সমিতিরও যৌথ দরকষাকষির অধিকারসহ একই ধরনের মৌলিক ক্ষমতা রয়েছে। শ্রমিক প্রতিনিধি ও কল্যাণ কমিটির ক্ষেত্রেও এ সমস্যার সমাধান কখনোই পুরোপুরি হয়নি। ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইনে আরো বলা হয়েছে যতদিন পর্যন্ত ইপিজেডের জন্য পৃথক শ্রম ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হবে না, ততদিন পর্যন্ত বর্তমান শ্রম আদালত ইপিজেডের শ্রম ট্রাইবুন্যাল হিসেবে কাজ করবে। ইপিজেডে বৃহত্তর আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইপিজেডের শ্রমিকরা এ আদালতের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে।

শ্রমিক কল্যাণ সমিতিকে বাইরের রাজনৈতিক দল বা এনজিও'র সাথে কোন সম্পর্ক তৈরি করতে নিষেধ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আইনে এনজিওর সাথে সম্পর্ক তৈরির ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন বর্তমানে ইপিজেডে যেসব শ্রমিক ও স্বাস্থ্য সংগঠনের কর্মসূচি রয়েছে সেগুলো চালিয়ে নেবার অনুমতি দেবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। অধিকন্তু ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইনে ২০১৩ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ইপিজেডে যেকোন ধরনের ধর্মঘট করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

২০০৯ সালে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম সীমিত করার জন্য শ্রম আইন সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনীর আওতায় প্রতিটি বন্দরে কেবল একটি ট্রেড ইউনিয়ন থাকতে পারবে। সংশোধনীটি আইনে পরিণত হবার ছয় মাসের মধ্যে এই ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে হবে। বর্তমানে যেসব ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে সেগুলো ভেঙ্গে দিতে হবে। যারা বন্দরে অন্তত একবছর ধরে কাজ করছেন কেবল তারাই এসব ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারবে। এ সংশোধনীতে আইন অমান্য করার শাস্তিও কমানো হয়েছে। শ্রম আন্দোলনের কর্মীরা এ সংশোধনীর প্রতিবাদ করে। তারা অভিযোগ করে মালিকদের সুবিধার জন্য এ সংশোধনী আনা হয়েছে, যদিও আইনটি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি।

বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তি প্রায় পাঁচ কোটি। এর মধ্যে প্রায় ১৯ লাখ বিভিন্ন সঙ্ঘভুক্ত এবং এসব সংঘের অনেকগুলো আবার কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। দেশের প্রায় সাড়ে চার হাজার পোশাক কারখানায় ৩০ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত আছে যাদের ৮০ ভাগেরও বেশি নারী। বিশাল অনানুষ্ঠানিক খাতের বিশ্বাসযোগ্য কোনো শ্রমিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি, যদিও বেশিরভাগ (প্রায় ৮০ শতাংশ) নাগরিক এই অনানুষ্ঠানিক খাতেই নিয়োজিত ।

গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাঙ্গা পুলিশ দিয়ে তাদের মজুরি বৃদ্ধির এ দাবি দমন করা হয়। ন্যূনতম মজুরির জন্য জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা বিক্ষোভে সম্পত্তির ধ্বংসসাধন, সড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টির জন্য সরকার কিছু ধর্মঘটকারী শ্রমিক নেতা ও শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে । বছরের শেষ পর্যন্ত এ মামলাগুলো অমীমাংসিত ছিল।

শ্রম আন্দোলনের সংগঠকরা ভয়ভীতি প্রদর্শন ও নিপীড়নের কথা এবং নিরাপত্তা বাহিনী ও জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার অনুসন্ধান বৃদ্ধি পাবার কথা জানায়। সারা দেশে, বিশেষত তৈরি পোশাক শিল্পে বিক্ষিপ্ত, কখনো কখনো প্রবল শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটেছে। শ্রমিক সংগঠকরা জানিয়েছেন, আলোচ্য সময়ে ভীতি প্রদর্শন, নিগ্রহ, কলকারখানায় একতরফা লক আউট ঘোষণা এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা ইউনিয়নের কাজকর্ম যখন তখন খতিয়ে দেখেছে। কর্তৃপক্ষ কখনও কখনও সম্পত্তির ধ্বংসসাধন বা অন্যান্য অভিযোগে শ্রমিক নেতাদের আটক করেছে - এনজিওগুলো যাকে শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের নেতাদের ওপর দমন হিসেবে উলে-খ করেছে।

জুলাই মাসে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বিসিডাবি-উএস (বাংলাদেশ শ্রমিক সংহতি কেন্দ্র)- কে একটি চিঠি পাঠিয়ে জানায় যে, এ কেন্দ্রের বৈদেশিক সাহায্যের অনুমোদন, যা ২০১০ সালে বন্ধ ছিল, কেবল তখনই প্রদান করা হবে যদি বিসিডাবি-উএস সংগঠনটির নিবন্ধন থেকে এর দুজন নেতাকে সরিয়ে ফেলে। তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার পর সহিংস আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ২০১০ সালে নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। প্রায় চার সপ্তাহ পর জামিনে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয় এবং কারাগারে তাদের সাথে দুর্ব্যবহারের নির্ভরযোগ্য অভিযোগ পাওয়া যায়। বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত তাদের বিচার শেষ হয়নি। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো তাদের চিঠিতে এ ঘটনাগুলোর উলে-খ করেছে, তবে বিসিডাবি-উএস এর প্রতিবাদ করে বলে যে সংশি-ষ্ট নেতাদেরকে কোন অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি বরং বৈধভাবে শ্রমিকদের পক্ষাবলম্বনের জন্য প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ হিসেবে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জুলাই মাসে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় জানায় যে কারিগরি ত্রুটির কারণে সংগঠনটিকে নিবন্ধন থেকে বাদ দেয়া হবে। দলের নেতারা মন্ত্রণালয়ের এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আপিল করতে থাকে। এ সিদ্ধান্ত সংগঠনটির যেকোন কাজকে কার্যকরভাবে বাধাগ্রস্ত করবে।

ইউনিয়নগুলো রাজনীতি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। তবে এগুলো সরকারের প্রভাবমুক্ত ছিল এবং পাট, বস্ত্র, রাসায়নিক শিল্পসহ রাষ্ট্রায়ত্ব কল-কারখানায় এবং সরকার-পরিচালিত চট্টগ্রাম বন্দরে এদের দাপট ছিল সবচেয়ে বেশি।

যৌথ দরকষাকষির আইনের বিধান সব জায়গায় সমানভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ব্যক্তিখাতের অনেক নিয়োগকর্তা ইউনিয়নের কার্যক্রমকে নিরুৎসাহিত করে। খুলনার হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস খাতে নবগঠিত বেশকয়েকটি ইউনিয়নের সাথে জড়িত শ্রমিকদের, পুরো নির্বাহী কমিটিসহ, ২০১০ সালে আপাতদৃষ্টিতে একযোগে অনেকগুলো কারখানা থেকে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে। নবগঠিত ইউনিয়নগুলোকে সাহায্যকারী শ্রম অধিকার বিষয়ক এনজিওগুলো অভিযোগ করে যে চাকুরিচ্যুত ইউনিয়ন সদস্যরা এখনো এ খাতে চাকরি পাচ্ছে না এবং ২০১০ সালের ছাটাইয়ের মাধ্যমে অধিকাংশ ইউনিয়নকেই কার্যকরভাবে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলা হয়েছে। এনজিও এবং শ্রমিকরা দাবিকরে যে মালিকেরা চাকুরি ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতিকে ইউনিয়নের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করছে। খুলনার সরকারি কর্মকর্তারা চাকুরিচ্যুতির বা হস্তক্ষেপের অভিযোগের ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য অনুসন্ধান পরিচালনা করেনি।

শ্রম বিষয়ক পরিচালকের দায়িত্ব হল রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য স্থানের ইউনিয়নের সাংগঠনিক বৈষম্য বিষয়ক অভিযোগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করা। তবে মন্ত্রণালয়ের নিজের নামেই ইউনিয়নের বৈধ আবেদন কোন কারণ ছাড়াই প্রত্যাখান করার অভিযোগ রয়েছে। ইউনিয়নের কর্মীরা অভিযোগ করে যে, মন্ত্রণালয় ইউনিয়নের সমর্থকদের তালিকা কারখানার মালিকদের জানিয়ে দেয়, যাতে ইউনিয়নের সমর্থকদের তারা ছাঁটাই করতে পারে। শ্রম আদালত ইউনিয়ন করার দায়ে চাকুরিচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্বহালের নির্দেশ দিতে পারে; তবে অমীমাংসিত মামলার বড় ধরনের জটের কারণে আলোচ্য বছর কোন কর্মী চাকুরিতে পুর্নবহাল হওয়ার আদেশ পায়নি। এই ধরনের মামলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শ্রমিকরা চাকুরিতে পুনর্বহালের দাবি করার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণের অর্থ চেয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে আরো বেশি সংখ্যক শ্রম বিরোধ শ্রম আদালতে শুনানির আগেই অনানুষ্ঠানিকভাবে মিটিয়ে ফেলা হয়েছে।

ইপিজেডগুলোতে ধর্মঘট করার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বেশ কয়েকদিনের জন্য শ্রমিক অসন্তোষের কারণে চট্টগ্রাম ইপিজেড বন্ধ ছিল। মধ্যবর্তী সময়ে ইপিজেডগুলোতে শ্রম আইনের অনুপস্থিতির কথা উলে-খ করে কিছু শ্রমিক সংগঠন ইপিজিডগুওেলাতে ২০১০ সালে শিল্প সম্পর্ক আইনের পুর্নপ্রবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে। অন্যান্যরা এর পদক্ষেপগুলোর প্রতিবাদ করেছে এবং ইপিজেডগুলোতে ইউনিয়ন করার পূর্ণাঙ্গ অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছে।

ইপিজেডের কারখানাগুলোর অনেক শ্রমিক সঙ্ঘ আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত নয়। কেননা যেসব শ্রমিকরা সঙ্ঘ গঠনের চেষ্টা করে তারা কিছু কিছু কারখানার মালিকদের পক্ষ থেকে বাধার সম্মুখীন হয়। কিছু কারখানার ব্যবস্থাপক বাইরের শ্রমিক সঙ্ঘের সাথে তাদের শ্রমিকদের বৈঠককে ভীষণভাবে নিরুৎসাহিত করে এবং অনেকসময় যেসব শ্রমিক এ ধরনের কাজ করে তাদেরকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করে।

ইপিজেডের শ্রমিক সংগঠনগুলোর মধ্যে ফেডারেশন গঠনের অনুমতি রয়েছে, তবে অন্যান্য ইপিজেডের প্রতিষ্ঠানের সাথে ফেডারেশন বা ইপিজেডের বাইরের প্রতিষ্ঠানের সাথে ফেডারেশন গঠন নিষিদ্ধ। এসব ফেডারেশন গঠনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে।

ইপিজেড কর্মকর্তারা সংকীর্ণভাবে এসব প্রবিধান এবং ২০১০ সালের শিল্প সম্পর্ক আইনের প্রযোজ্য বিধানগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, দেশের ইপিজেডগুলো বাংলাদেশ শ্রম আইনের ব্যাপক আওতার বাইরে। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন তাদের এই ধারণা চ্যালেঞ্জ করে। ইপিজেডের যেসব কারখানা বাংলাদেশ শ্রম আইন মানেনি শ্রমিকরা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তবে বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত এসব মামলার কোন নিস্পত্তি হয়নি।

বাধ্যতামূলক বা জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ

বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় বা কাউকে আটকে রেখে তার কাছ থেকে শ্রম আদায় নিষিদ্ধ। তবে এই আইন লঙ্ঘনকারীদের জন্য এক বছরের কারাদণ্ড কিংবা জরিমানা আদায়ের বিধান এই অপরাধ থেকে

কাউকে নিবৃত্ত করার মত যথেষ্ট কঠোর ছিল না। সরকার কার্যকরভাবে এসব বিধিনিষেধ প্রয়োগ করেনি। বাধ্যতামূলক শ্রম বিরোধী আইন জোরদার করার জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে এই আইন সেভাবে প্রয়োগ হয়নি।

কিছু বাংলাদেশি পুরুষ যাদেরকে চাকুরির ভুয়া প্রস্তাব দিয়ে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদেরকে বাধ্যতামূলক শ্রমের বা দেনার জালে আটকে নিপীড়ন করা হয়।

শহর এলাকায় বিরল হলেও গ্রামাঞ্চলে এবং বাসাবাড়ির কাজে বাধ্যতামূলক শ্রমদানের ঘটনা বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশী শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের গৃহভৃত্য এবং পরাধীন শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। তাদের চলাফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, বেতন দেয়া হয় না, হুমকি দেয়া হয় এবং যৌন ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়। চরম দারিদ্র্য এবং বেকারত্বের কারণে গ্রামীণ শ্রমিকরা এবং কখনও কখনও গোটা পরিবার বাধ্যতামূলক শ্রমদানে নিয়োজিত ছিল। এরা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং কখনও কখনও কেউ কেউ প্রাণও হারিয়েছে। ডিসেম্বরের ২৩ তারিখে সরকার সমন্বিত পাচার বিরোধী আইনকে কার্যে পরিণত করার জন্য একটি অর্ডিনেন্স জারি করে যাতে বাধ্যতামূলক শ্রমকে পাচার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। নতুন আইনে বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার ব্যক্তিদের পাচারের শিকার ব্যক্তিরা যেসব সুরক্ষা সেবা লাভ করে সেগুলোসহ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়লাভের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের *বার্ষিক মানব পাচার* প্রতিবেদনও দেখুন, যা এই ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে: www.state.gov/j/tip.

শিশু শ্রম রোধ এবং চাকুরির ন্যূনতম বয়স

দেশের আইন অনুযায়ী প্রত্যেক শিশুর পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অথবা ১০ বছর বয়স পর্যন্ত লেখা-পড়া করা বাধ্যতামূলক। তবে এই আইন প্রয়োগের কার্যকর কোন বিধান নেই এবং দেশে শিশুশ্রম ব্যাপক। বাংলাদেশ শ্রম আইন কাজের ধরন ও শিশুর বয়স অনুযায়ী শিশুদের চাকুরি নিয়ন্ত্রণ করে। আইনে শিশু শ্রম আইন লঙ্ঘনের শাস্তি র কথা উলেখ আছে। নামমাত্র শাস্তি সাধারণত ৫ হাজার টাকার কম।

আইএলও জানায় ৭০ লক্ষ শিশু শ্রমিক রয়েছে এবং তাদের মধ্যে ১৩ লক্ষ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ খাতে কাজ করে।

আলোচ্য বছরে ঢাকা ভিত্তিক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সার্ভিসেস এন্ড সল্যুশনস ইন্টারন্যাশনাল দেখতে পায় যে, শিশুরা প্রায়শই সড়ক পরিববহনের মত বিভিন্ন শিল্পের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে থাকে। যেমন, রিকশা চালানো, মোটরযান মেরামত, মিনি বাসের হেলপার, যন্ত্রপাতির কারখানা, লবণ ও ম্যাচের কারখানা, ট্যানারি এবং ইট, সিগারেট, শুঁটকি মাছ, জুতা, স্টিলের ফার্নিচার, গ-াস, বস্ত্র, পোশাক এবং সাবান শিল্পে কর্মরত ছিল। যেসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুরা নিয়োজিত ছিল সেগুলো হলো: প্রিন্টিং, ফেব্রিকেশন বা সংযোজন কারখানা, পাথর ভাঙ্গা, রঙ করার কারখানা, কর্মকারদের সহকারী এবং নির্মাণ শিল্প। সেবা খাতে হোটেল এবং রেস্টুরেন্টেও শিশুরা কাজ করেছে। ২০০৩ সালে শহরাঞ্চলে পরিচালিত এক সরকারি জরিপে দেখা যায়, পথ শিশুরা, প্রধাণত ছেলেরা, ভিক্ষাবৃত্তি, কুলির কাজ করা, জুতা পালিশ করা, কাগজ কুড়ানো এবং ফুল বিক্রি করার মত কাজে নিয়োজিত

ছিল। বিশেষত রাস্তায় বসবাসকারী ছেলে ও মেয়েদেরকে মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের মত অবৈধ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

শিশুরা বাসাবাড়ির কাজকর্মে নিয়মিতই নিয়োজিত থেকেছে। গৃহপরিচারিকা নির্যাতনকারী গৃহকর্তাদের বিরুদ্ধে সরকার কখনও কখনও ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে।

শহরাঞ্চলের ব্যাপক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের তুলনায় শ্রম মন্ত্রণালয়ের আইন প্রয়োগ ব্যবস্থা ছিল অপর্যাপ্ত। রফতানিমুখী পোশাক ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের বাইরে শিশুশ্রম আইনের প্রয়োগ তেমন ছিল না। কৃষি ও অন্যান্য অ-প্রচলিত যেসব খাতের ওপর সরকারি নজরদারি তেমন নেই সেসব খাতেই সবচেয়ে বেশি শিশুশ্রমিক নিয়োজিত ছিল।

শিশুশ্রমের ব্যাপারে সকল পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপ সমন্বয়ের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি শিশু শ্রম বিষয়ক ইউনিট ছিল।

www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm তে গিয়ে নিকৃষ্ট ধরনের শিশু শ্রমের ওপর শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্ত তথ্য দেখুন।

ঙ. কাজের গ্রহণযোগ্য শর্তাবলি

যেসব শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট মজুরি কাঠামো রয়েছে সেগুলো ছাড়া অন্য সব অর্থনৈতিক খাতের শ্রমিকদের জন্য জাতীয় সর্বনিম্ন মজুরি বোর্ড পাঁচ বছর মেয়াদে, ২০০৭-১২ সাল পর্যন্ত, ১,৫০০ টাকা সর্বনিম্ন মাসিক মজুরি নির্ধারণ করেছে। এই বোর্ড যেকোন সময় বৈঠকে বসতে পারে, তবে একে প্রতি পাঁচ বছর পরপর প্রতিটি শিল্পের জন্য আলাদা আলাদা মজুরি কাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণের জন্য এক ত্রিপক্ষীয় ফোরামে মিলিত হতে হবে। ২০১০ সালের জুন মাসে শ্রম মন্ত্রণালয় পোশাক শিল্পের সর্বনিম্ন মজুরি মাসিক ১৬৬২ টাকা ($২১) থেকে ৩০০০ টাকায় ($৩৮)উন্নীত করে। তবে কখনও কখনও ন্যূনতম মজুরির চেয়ে অধিক মজুরি দেওয়া হয়। দেশের ইপিজেডগুলোয় মজুরির হার জাতীয় মজুরির হারের চেয়ে বেশ বেশি ছিল। ধার্যকৃত সর্বনিম্ন মজুরির কোন হারই শহরের বাসিন্দাদের ভালোভাবে খেয়ে পরে বাঁচার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। পোশাক কারখানায় শ্রমিকদেরকে ওভারটাইম করতে বাধ্য করা, মাসের পর মাস বেতন না দেয়া এবং ছুটির পূর্ণ সুযোগপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করার ঘটনা ঘটেছে হরহামেশা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুর্যোর কল্যাণ পরিবীক্ষণ সমীক্ষা অনুসারে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩১.৯ শতাংশ।

সাধারণ নিয়মে আট ঘণ্টায় এক কর্ম দিবস, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে একজন শ্রমিক ১০ ঘণ্টা কাজ করতে পারেন। ওভারটাইমের অনুমতি রয়েছে তবে সেক্ষেত্রে মালিককে মূল বেতন ও অন্যান্য ভাতার দ্বিগুণ পরিশোধ করতে হয় এবং অন্তর্বর্তী মজুরি দিতে হয়। প্রচলিত শ্রম সপ্তাহ হচ্ছে ৪৮ ঘণ্টার, তবে ওভারটাইম পরিশোধ

করলে তা ৬০ ঘণ্টা পর্যন্ত করার বিধান আছে। তবে বছরে গড় শ্রম সপ্তাহ ৫৬ ঘণ্টার বেশি হবে না বলে আইনে উলে-খ আছে। দিনে ৬ ঘণ্টার বেশি কাজ করলে শ্রমিকদের ১ ঘণ্টার বিশ্রাম দিতে হবে, দিনে ৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করলে আধ ঘণ্টার বিশ্রাম দিতে হবে, এবং দিনে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করলে বিরতির সময় ১ ঘণ্টা বিশ্রামের সময় দিতে হবে। কারখানার শ্রমিকরা সপ্তাহে একদিন ছুটি পায়। দোকান কর্মচারীরা পায় সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি।

বাস্তবে এসব আইনগত বাধ্য-বাধকতা প্রায় নিয়মিতভাবেই লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং এসব বিধানের বাস্তবায়ন ছিল খুবই দুর্বল। তৈরি পোশাক শিল্পখাতে রপ্তানির সর্বশেষ সময়সীমা রক্ষার জন্য নিয়োগকর্তারা অনেকসময় শ্রমিকদের দিনে ১২ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় কাজ করার শর্তারোপ করে, কিন্তু তারা এ সময়ের জন্য শ্রমিকদের সবসময় উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করেনি।

বাংলাদেশ শ্রম আইনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মানদণ্ড নিরূপণ করা আছে। শ্রমিক সংগঠনগুলো জানায়, আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত এই মানদণ্ড যথেষ্ঠ, কিন্তু এগুলোর বাস্তবায়ন কদাচিৎ হয়ে থাকে। এই আইনের বিধান প্রয়োগ না হলে শ্রমিকরা আইনের আশ্রয় নিতে পারেন, তবে আইনের আশ্রয় নেয়ার ঘটনা একেবারে হাতে গোনা। শ্রম আইন বাস্তবায়নে শ্রম মন্ত্রণালয়ের শিল্প পরিদর্শকদের ভূমিকাও দুর্বল। এর প্রধান কারণ হল তাদের সংখ্যার স্বল্পতা। পরিদর্শকরা পরিদর্শনে গেছেন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই। তবে অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক গোষ্ঠীগুলো অভিযোগ করেছে, পরিদর্শকরা মালিকদেরকে তাদের পরিদর্শন সম্পর্কে আগে-ভাগে খবর দিয়েছেন এবং তাদের সাথে মালিকদের যোগসাজশ আছে। সারা দেশে ৯৫ জন পরিদর্শক কর্মরত ছিলেন যাদের মধ্যে ৫০জন কর্মরত ছিলেন কারখানা বিভাগে। মন্ত্রণালয় ৫৯টি খালি পদ পূরণ করেনি। অনেক শ্রমিক অভিযোগ করে যে, এই খাতে পদ্ধতিগত ও ব্যাপক দুর্নীতি এবং পরিদর্শকদের অদক্ষতা রয়েছে।

অনেক কর্মস্থলেই নিরাপত্তা ব্যবস্থার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। বেকারত্বের অধিক হার এবং আইনের দুর্বল প্রয়োগের কারণে বিপজ্জনক কাজের পরিবেশের উন্নয়ন দাবি করলে অথবা ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে অস্বীকার করলে শ্রমিকদের চাকুরি হারানোর ভয় ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, মার্চের ১০ তারিখে, রাজধানীর শ্যামপুর শিল্প এলাকায় গার্মেন্টস ডাইয়িং ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আটজন শ্রমিক মারা যায়। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুসারে দরজা বন্ধ থাকায় পালানোর পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে বাধার সৃষ্টি হয়।